ওঽম্

জুলাই-সেপ্টেম্বর ২০২২

আর্য জ্যোতি

বাংলাদেশ অগ্নিবীর দ্বারা প্রকাশিত ত্রৈমাসিক পত্রিকা

১ম সংখ্যা

জন্মাষ্টমী বিশেষ সংখ্যা

১৯৮ দয়ানন্দাব্দ; ২০৭৯ বিক্রমাব্দ, শ্রাবণ-আশ্বিন; ৫১২৩ কলি সংবৎ; ১,৯৬,০৮,৫৩,১২৩ সৃষ্টি সংবৎ

সূচিপত্র

1. সম্পাদকীয় 04
2. নবয়োজনা- সাফল্যম্..... 05
3. কুরুক্ষেত্র যুদ্ধের কাল নির্ণয় 07
4. শ্রীকৃষ্ণ 09
5. শ্রীকৃষ্ণের বাল্যবিবাহ! 20
6. Lord Krishna: An enlightened Personality 26
7. আমার আরাধ্য ভগবান শ্রীকৃষ্ণ 31
8. ভগবান শ্রীকৃষ্ণের পুনরায় আবাহন 38
9. সনাতন ধর্মের মহান পুরুষ, যোগেশ্বর ভগবান শ্রীকৃষ্ণ 41
10. বিশ্বজয়ী শ্রীকৃষ্ণ 43
11. আর্যশ্রেষ্ঠ শ্রীকৃষ্ণ 46
12. কৃষ্ণচরিতঃ কৃষ্ণের বহুবিবাহ 53
13. নক্ষত্রের মধ্যে চন্দ্র (শঙ্কা সমাধান) 58
14. শ্রীকৃষ্ণের চক্র কী আসলেই কোনো দিব্যাস্ত্র? 63
15. ইতিহাসের পাতায় শ্রীকৃষ্ণ 64
16. মাধব, বহুত মিনতি কর তুঁই দেই তুলসী তিল 66
17. গীতায় কী জিহাদের উপদেশ দেওয়া হয়েছে? 68

প্রকাশক: স্বাধ্যায় প্রকাশনী
বাংলাদেশ অগ্নিবীর

©বাংলাদেশ অগ্নিবীর
সর্বস্বত্ব সংরক্ষিত; প্রকাশকের অনুমতি ছাড়া যেকোনো মাধ্যমে
বইটি আংশিক বা সম্পূর্ণ প্রকাশ নিষিদ্ধ

প্রচ্ছদঃ শ্রী বন্ধন বিশ্বাস
Pdf নির্মাণেঃ শ্রী বন্ধন বিশ্বাস

মূল্যঃ বিনামূল্যে বিতরণের জন্য

ॐ

“শ্রীকৃষ্ণের ইতিহাস মহাভারতে অতি উত্তম। ওনার গুণ, কর্ম, স্বভাব এবং চরিত্র আপ্ত পুরুষের সদৃশ। সেখানে শ্রীকৃষ্ণ কোন অধর্মের আচরণ এবং জন্ম থেকে মৃত্যু পর্যন্ত কোন খারাপ কাজ করেছেন, এ রকম লেখা নেই।”

-মহর্ষি দয়ানন্দ সরস্বতী
একাদশ সমুল্লাস, সত্যার্থ প্রকাশ

সম্পাদকীয়

ওঽম্

বাংলাদেশ অগ্নিবীরের ত্রৈমাসিক পত্রিকা **"আর্ষ জ্যোতি"**-র ১ম সংখ্যা যোগেশ্বর ভগবান শ্রীকৃষ্ণের শুভ জন্মাষ্টমীতে প্রকাশ করতে পেরে আমরা আনন্দিত ও গর্বিত। আমাদের এই পত্রিকা অব্যহত থাকবে। প্রস্তুতকৃত সংখ্যার লেখকবৃন্দ, সংগ্রাহক শ্রী সৈকত দাস ও অন্তর্জালিক সংস্করণ নির্মাণে শ্রী বন্ধন বিশ্বাসকে জানাই আন্তরিক ধন্যবাদ ও কৃতজ্ঞতা।

পরমকরণাসাগর দয়ানিধি পরমেশ্বর সকলের পরিশ্রমকে স্বীকার করুন।

শ্রী দীপংকর সিংহ দীপ
শিক্ষা ও শাস্ত্রার্থ সমন্বয়ক
বাংলাদেশ অগ্নিবীর
dipangkar.agniveerofficial@gmail.com

◇◇◇

নবয়োজনা- সাফল্যম্

ড. কপিলদেব দ্বিবেদী

সুখদ-সিদ্ধিকরং নবযোজনং
দিশতু ভারত-ভূ-বলয়ে সুখম্ ।
অনুদিনং জনতা জন-তাপ-হঃ
স্বকৃতিভিশ্চ সমর্থনমেধয়েৎ ॥

ইদমভেদ্য-তমস্ততি-নাশকং
দুরিত-দুষ্কৃত-দৈন্য-নিবারকম্ ।
সুকৃত শান্তি-সুধারস-বর্ষকং
জয়তু সন্ততমেব নিয়োজনম্ ॥

বসন-ভোজন-পেয়-সমুচ্চয়ো
ভবন-ভূতি-নিবাস-সুখোচ্চয়ঃ ।
কৃষি-সমুন্নতি-রাষ্ট্র-গুণোচ্ছ্রয়ো
বসতু ভারত-ভূ-জনতাঽঽলয়ে ॥

নব-নবোদ্যম-শক্তি-প্রদোদ্যমোঽ-
নবরতং বসু বৃদ্ধি-করঃ শ্রমঃ ।
সততমাত্ম-হিতায় শ্রমাশ্রয়ো
দিশতি রাম সুখৌঘ সমেধিতম্ ॥

কৃষিকৃতৌ নলকূপ-সমাশ্রয়ং
প্রতিদিশং তনুতে কৃষি-বর্ধনম্ ।
হরিতিমা হরতে কৃষকাঽঽবলে
সকল-দুঃখততিং সুখ-সাধনৈঃ ॥

ভবন-হীন-জনৈর্ভবনং কৃতং
অবনি-হীন-নরৈরবনি শ্রিতা ।
বসন-হীন-নৃভির্বসনং ঘৃতং
কৃষি-বিহীন-নরৈঃ কৃষিভূর্বৃতা ॥

প্রতিবিশং নগরেষু সুখোচ্চয়ঃ
প্রতিপদং সুষমা শ্রমিণা গৃহে ।
ভবন ভোজন-সৌখ্য সমুচ্ছ্রয়োঃ
বসন বাস-মুখং তনুতে হিতম্ ॥

নব-বিধান-সমাশ্রয়ণেন যদ্
হিতমিদং বিহিতং হিত কাম্যযা ।
ঋণজ-বন্ধন-গ্রস্ত-জনাবলিঃ
সুখদ-মুক্তিমহো লভতেতরাম্ ॥

ধনিবরা ধন সংগ্রহমেব যে
হিতধিয়া ব্যদধুর্দুরিতাবহম্ ।
সকলমেব তু তদ্ধন-সংগ্রহম্
অপহৃতং নৃ-হিতায় প্রশাসকৈঃ ॥

নিখিল-গ্রামচয়েঽদ্য বিরাজতে
বিপুল বিদ্যুদুপস্কর-সংগ্রহঃ ।
কৃষিজ ধান্যততিবসনাবলিং
নব-বিকাসজ-সৌখ্য-সমুচ্চয়ঃ ॥

সুখবিধা বিবিধা নগরেষু চ
প্রতিপদং বিতনোতি সুখশ্রিয়ম্ ।
সরণি-নীর-প্রকাশ-গৃহাশ্রয়াঃ
কতিবিধাঃ সুবিধা নহি লম্ভিতাঃ ॥

সততমদ্য বিলোক্যত এব যৎ
প্রশমিতা জন-তাপ-করী কৃতিঃ ।
বটুজনে নগরে ন পুরেঽপি চ
ক্বশ্চিদ্-শান্তি-ততিস্তনুতে পদম্ ॥

বটুজনে বিততাঽভিরুচির্গুণৈঃ
শ্রমচয়ে রুচিরা হিতধীঃ শ্রিতা ।
জন হিতায় সমাজ-সুখায় তে
শ্রমমবেক্ষ্য হিতং দধতে শিবম্ ॥

পঠন পাঠন-সাধন সংগ্রহে
হিততিং তনুতেঽত্র প্রশাসনম্ ।
বটুজনস্য চ শিক্ষক-সংহতে
দিশতি শাসনমদ্য সুখাবলিম্ ॥

গুণধি-গান্ধি মহাত্মভিরাশ্রিতা
ভরত ভূ-বিষয়ে রুচিরা স্থিতিঃ ।
সুখমহো স হি স্বপ্ন-সমুচ্চয়
সফলতামিহ যাতি সুখাবহঃ ॥

প্রতিদিনং যদুপৈত্যুপয়োগিতা ।
তদিহ বস্তু নিয়ন্ত্রিত-মূল্যকম্ ।
ন সহতেঽর্ধ-বিবৃদ্ধিমথঃ ক্বশ্চিদ্
অনয়-বারণ-দারুণ শাসনম্ ॥

কৃষক-কর্মণি যে নিয়তং রতাঃ,
ধরণিমাপুরিমে কৃপি-কর্মণে ।
বিতরতীহ প্রশাসন-সূত্রকং
জলমলং বিমলং বরং-বীজম্ ॥

লয়মুপৈতি কুরীতি-প্রথাঽখিলা
প্রশমমেতি দিবং গমনং ক্ষুধা ।
সুখদমেত্যনুশাসন-জালকং
উদয়মেতি চ ভারত-গৌরবম্ ॥

প্রতিদিশং পরিবর্তনমীক্ষ্যতে
প্রতিগৃহং ধন ধান্য-সমুচ্চয় ।
প্রতিজনং জনতা হিত লালসা
প্রতিপলং প্রগতিঃ সুখ-সাধনে ॥

বরদ-যোজন-কার্যমিদং মুদে
সুখ-সমুন্নতি শান্তি-হিতাবহম্ ।
জন-মনঃ সু দধদ্ নবচেতনাং
সকললোক-সমর্থনমাবহেৎ ॥

কুরুক্ষেত্র যুদ্ধের কাল নির্ণয়

ডা. শ্রী নিলয় আর্য

কুরুক্ষেত্র যুদ্ধ কয় তারিখ সংগঠিত হয়েছিল?

পাঠকমনে এই প্রশ্ন থাকতেই পারে। প্রত্নতাত্ত্বিকভাবে প্রমাণিত এই ঐতিহাসিক যুদ্ধটিকে টিভি সিরিয়াল, বইপত্র এবং মিডিয়াতে একদম রূপকথার মত করে উপস্থাপন করা হয়। যার ফলে বর্তমান প্রজন্মের অধিকাংশ হিন্দু ছেলেমেয়েরা একে শুধুই গল্প হিসেবে জেনে বড় হচ্ছে, এতে বাড়ছে ধর্মান্তরিত হবার প্রবণতা এবং হিন্দুদের সংখ্যা দিনদিন হ্রাস পাচ্ছে।

মহাভারত ভীষ্মপর্বের ৬/১১৯/৯৮,৯৯,১০০ এই শ্লোক তিনটি দেখে নিই-

কথং মহাত্মা গাঙ্গেয়ঃ সর্বশস্ত্রভৃতাং বরঃ ।
কালকর্তা নরব্যাঘ্রঃ সংপ্রাপ্তে দক্ষিণায়নে ॥
স্থিতোঽস্মীতি চ গাঙ্গেয়স্তচ্ছ্রুৎবা বাক্যমব্রবীৎ।
ধারয়িষ্যাম্যহং প্রাণান্পতিতিঽপি মহীতলে ॥
উত্তরায়ণমন্বিচ্ছন্সুগতি প্রতিকাঙ্ক্ষয়া।

অর্থাৎ আমরা দেখতে পাচ্ছি যুদ্ধের ১০ম দিন যেদিন যুদ্ধক্ষেত্রে আহত হয়ে পিতামহ ভীষ্মের পতন হল,তিনি অত্যন্ত আহত হলেন তখন চলছিল দক্ষিণায়ন,আর যোগীদের জন্য দেহত্যাগ এর শ্রেষ্ঠ সময় ধরা হয় উত্তরায়ণকে, তাই ভীষ্ম বললেন আমি এখন দেহত্যাগ করবনা,আমার আকাঙ্ক্ষা উত্তরায়ণের প্রারম্ভে দেহত্যাগ করব।

কিন্তু উত্তরায়ণ বা দক্ষিণায়ণ কি জিনিস?

আমরা জানি পৃথিবী খ-গোলকের কেন্দ্রে উপবৃত্তাকার পথে পরিভ্রমণ করে।বছরের অর্ধেক সময় সে উত্তর থেকে দক্ষিণ দিকে যায় যাকে বলা হয় দক্ষিণায়ণ (২২শে জুন থেকে ২১ শে ডিসেম্বর), ২২ শে ডিসেম্বর থেকে পৃথিবী আবার দক্ষিন দিক থেকে উত্তর দিকে পরিভ্রমণ শুরু করে যাকে বলে উত্তরায়ণ।
এখন ভীষ্ম বললেন তিনি উত্তরায়ণের দিন দেহত্যাগ করবেন (তিনি যোগীপুরুষ ছিলেন যার ফলে স্বেচ্ছায় দেহত্যাগ করতে পারতেন)।তার মানে যুদ্ধের ১০ তম দিন থেকে ২২ শে ডিসেম্বর এই সময় পর্যন্ত তিনি আহত অবস্থায় বেঁচে ছিলেন।
এখন আমরা যাব অনুশাসন পর্বে। অনুশাসন পর্ব ১৩/২৭৩/৫,৬ বলছে-

উষিৎবা শর্বরীঃ শ্রীমান্পঞ্চাশন্নগরোত্তমে।
সময়ং কৌরবাগ্র্যস্য সস্মার পুরুষর্ষভঃ॥
স নির্যযৌ জগপুরাদ্যজকৈঃ পরিবারিতঃ।
দৃষ্ট্বা নিবৃত্তমাদিত্যং প্রবৃত্তং চোত্তরায়ণম্॥

অর্থাৎ আশীর্বাদপ্রাপ্ত রাজা যুধিষ্ঠির যুদ্ধের পর এভাবে ৫০ রাত রাজধানীতে কাটালেন, তখন উত্তরায়ণ হল, তাঁর পিতামহের বিদায়ের সময় এল বলে তিনি হাতিতে চড়ে দলবল নিয়ে

সেদিকে রওনা হলেন।
১৩.২৭৩.২৮ এ পিতামহ ভীষ্ম নিজেই বলছেন-

অষ্টপঞ্চাশতং রাত্র্যঃ শয়ানস্যাদ্য মে গতাঃ।

অর্থাৎ ৫৮ দিন ধরে আমি শায়িত (তিনি যুদ্ধের ১০ তম দিনে আহত হয়েছিলেন,যুদ্ধ চলে ১৮ দিন,অর্থাৎ যুদ্ধের শেষ ৮ দিন ও যুদ্ধের পরে ৫০ দিন মোট ৫৮ দিন ধরে তিনি শয্যাশায়ী)।
এরপর বললেন-

মাঘোঽয়ং সমনুপ্রাপ্তো মাসঃ পুণ্যো যুধিষ্ঠির।
ত্রিভাগশেষঃ পক্ষোঽয়ং শুক্লো ভবিতুমর্হতি॥
(১৩.২৭৮.২৮)

অর্থাৎ মাঘ মাসের শুক্লপক্ষের ৪ তারিখ পেরিয়ে গেছে (মানে সেদিন ৫ তারিখ,টীকাকার নীলকণ্ঠও তাই বলেছেন যে সেদিন মাঘের শুক্লপঞ্চমী ছিল)।
এখন তাহলে মাঘ মাসের শুক্লপক্ষের ৫ তারিখ বা মাঘ মাসের ২০ তারিখ যা ইংরেজিতে ডিসেম্বরের ৫ তারিখ সেদিন হতে ৫০ দিন বিয়োগ দিলেই আমরা বুঝতে পারি যুদ্ধ কোনদিন শেষ হয়েছিল আর তা হল ২রা নভেম্বর!
আর যেহেতু যুদ্ধ ১৮ দিন চলেছিল তাহলে তা শুরু হয়েছিল ২ রা নভেম্বর থেকে ১৮ দিন আগে বা ১৬ ই অক্টোবর!
আর ভীষ্ম আহত হয়েছিলেন যুদ্ধের ১০ তম দিন তথা ২৫ শে অক্টোবর, এর পরের ৫ দিন দ্রোণাচার্য সেনাপতি ছিলেন মানে ৩০ শে অক্টোবর পর্যন্ত। তার সেনাপতিত্বের তৃতীয় দিন মানে ২৮ শে অক্টোবর অভিমন্যুকে অন্যায় যুদ্ধে হত্যা করা হয়।৩১ শে অক্টোবর ও ১ লা নভেম্বর এই দুইদিন সেনাপতি ছিলেন কর্ণ,তার পতন হলে যুদ্ধের শেষদিন শল্য সেনাপতি হিসেবে যুদ্ধ করেন এবং সেদিন ২ রা নভেম্বর কৌরবদের পতন হয়।
এভাবেই ১৮ দিনে শেষ হয় কুরুক্ষেত্র মহাযুদ্ধ। এই মহাযুদ্ধের বাস্তব অস্তিত্ব প্রত্নতাত্ত্বিক অনুসন্ধানে প্রমাণিত হলেও আমরা হিন্দুরা এখনো তা নিয়ে অজ্ঞানতার সাগরে নিমজ্জিত রয়ে গেছি। ভবিষ্যত প্রজন্মকে এগুলো জানানোর, পড়ানোর কেউ নেই। ভারত,বাংলাদেশের পাঠ্যক্রমে নেই এসব ঐতিহাসিক তথ্যাদির উপস্থিতি। ভারত ভুলে গেছে ভারতযুদ্ধের কথা, ইতিহাস যে ভুলে যায় তার ভবিষ্যতের কি অস্তিত্ব থাকে?

প্রশ্ন রইল।

শ্রীকৃষ্ণ

গবেষণা পরিষদ, বাংলাদেশ অগ্নিবীর

জন্মাষ্টমী, প্রতি বছর এই দিনটি এলেই আনন্দে, উৎসাহে, কর্মশক্তিতে মনটা ভরে উঠে। আজ এমন একজনের আবির্ভাবতিথি যিনি তাঁর জীবনে ও কর্মে আমাদের শিখিয়ে গেছেন কর্মযোগ কি বস্তু। তিনি সর্বদা কর্মে লিপ্ত থেকেছেন, সমাজের জন্য, রাষ্ট্রের জন্য। তথাকথিত ধর্মগুরুদের মত কর্ম ত্যাগ করে সন্ন্যাসের নাম করে আয়েশ করেন নি। বলেছেন মোহবশত কর্মের ত্যাগ তামসিক ত্যাগ। তিনি জানতেন **যদ্ যদ্ আচরতি শ্রেষ্ঠস্তত্তদেবেতরো জনঃ,** সমাজের নেতৃত্বস্থানীয় ব্যাক্তিরা যা যা কর্ম করবেন, যা যা আচরণ করবেন তাই সাধারণ মানুষেরা অনুসরণ করবে। তাই তিনি সারাজীবন কর্ম করে গেছেন আমাদের সামনে দৃষ্টান্ত স্থাপন করে যাবার জন্য। তিনি সংগ্রাম করেছেন,লড়াই করেছেন, সংসার করেছেন, সংসার সাগরের সাথে বিক্ষোভও করেছেন, তিনি নাচ, গান, জপ করে জীবন অতিবাহিত করেন নি।

প্রতিবছর এই পূণ্যতিথিতে আমরা মাসব্যাপী জ্ঞানযজ্ঞ করে থাকি, মহাভারত ও শ্রীকৃষ্ণকে নিয়ে বিভিন্ন গবেষণামূলক প্রবন্ধ, সেমিনারের আয়োজন করে থাকি। তবে এই বছর পরিবর্তিত বৈশ্বিক পরিস্থিতিতে তা সম্ভব হয়নি। কিন্তু আমাদের এই জ্ঞানযজ্ঞ চালিয়ে যাব। শ্রীকৃষ্ণ নিজেই আমাদের দিয়ে গিয়েছিলেন এই শিক্ষা,

ন হি জ্ঞানেন সদৃশং পবিত্রমিহ বিদ্যতে

এই জগতে জ্ঞানের সদৃশ পবিত্র বস্তু আর কিছুই নেই। তার ধারাবাহিকতায় ই কয়েক পর্বে আমরা দেখে নেব সংক্ষেপে এই মহান ব্যক্তিত্বের জীবনীর সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ ঘটনাসমূহ।তার প্রথম পর্ব থাকবে আজ।

শ্রীকৃষ্ণের জীবনীকে মূলত দুইটি ভাগে ভাগ করা যায়। মহাভারতে প্রাপ্ত তাঁর জীবনের প্রাপ্তবয়স্ক অংশের ঘটনা ও হরিবংশ, বিষ্ণুপুরাণ, ভাগবত পুরাণে পাওয়া যাওয়া অলৌকিকত্ব মিশ্রিত বাল্যকালের বর্ণনা।

Oriental Study বা প্রাচ্যবিদ্যার জনক, বিখ্যাত পাণ্ডুলিপি বিশেষজ্ঞ, ভারতের রাষ্ট্রীয় পাণ্ডুলিপি সংস্থা Bhandarkal Oriental Research Institute যাঁর নামে নামকরণ করা হয়েছে সেই Dr. R G Bhandarkar তাঁর Vaishnavaism,Shaivaism and other minor sects গ্রন্থে দেখিয়েছেন যে শ্রীকৃষ্ণের বাল্যকালের ঘটনাসমূহ আসলে খ্রিষ্টীয় শতকের আগে কখনো লিপিবদ্ধ হয়নি। শ্রীকৃষ্ণ প্রাচীনকালে তার পূর্ণ বয়সের রাজনৈতিক, সামরিক, সামাজিক ভূমিকার কারণেই জনপ্রিয় ছিলেন। পরবর্তীতে খ্রিষ্ট জন্মের পরের সময়ে বিভিন্ন অলৌকিক কাহিনী মিশ্রিত করে তার বাল্যকাল লেখা হয় পুরাণ নামক বিভিন্ন গ্রন্থে।

উদাহরণস্বরুপ ধরুন তাঁর জন্মের সময়ের একটি

কাহিনী। আমরা টিভিতে দেখে থাকি তাঁর জন্মের সময়ে তাঁকে লুকিয়ে নিয়ে যাওয়া হয়েছিল যশোদার ঘরে আর সেখানে রাখা হয়েছিল আরেক কন্যাশিশুকে। সেই কন্যাশিশুটিকে কংস হত্যা করতে গেলে সে অলৌকিকভাবে তার হাত থেকে ছুটে হাহা করে অট্টহাস্য করতে করতে উপরের দিকে উড়ে চলে যায় আর শ্রীকৃষ্ণের হাতে কংসের মৃত্যুর ভবিষ্যৎবাণী করে। সচেতন পাঠকমাত্রেই বুঝবেন এটা অতিপ্রাকৃত কাহিনী, বাস্তব ঘটনা নয়। তাহলে বাস্তব ঘটনা কি ছিল?

হরিবংশ ২.৪.৩৬ অনুযায়ী কংস নতুন শিশুর জন্মের সংবাদ পেয়ে ছুটে আসে এবং বালিকাটিকে পাথরে ছুড়ে মারেন। পরবর্তীকালের রচনা ভাগবত ও বিষ্ণুপুরাণ অনুযায়ী কংস বালিকাটিকে হাতে নেয়া মাত্রই সে আকাশে উড়ে গিয়েছিল,অর্থাৎ তুলনামূলক প্রাচীন হরিবংশে পাথরে পিষে বা ছুঁড়ে মারার কথাটি রয়েছে, সেটিই পরবর্তীতে বিকৃত হয়ে এই অলৌকিক কাহিনীতে পরিণত হয়। পরবর্তীকালের কবিরা ভাগবত ও বিষ্ণুপুরাণে এবং হরিবংশের প্রক্ষিপ্ত অংশে এই অলৌকিক কাহিনী রচনা করে। এভাবেই ক্রমে ক্রমে বাস্তবের ব্যাক্তি শ্রীকৃষ্ণ মিথলজিতে পরিণত হয়,আর তাই আজ বিধর্মী ও নাস্তিকরা শ্রীরাম ও শ্রীকৃষ্ণকে অবাস্তব কাহিনী বলার ধৃষ্টতা দেখানোর সুযোগ পায়। এই দায় আমাদেরই।

একইভাবে কেন কংস তার বোনের সন্তানকে হত্যা করতে চাইবেন তাও আমরা বুঝে নিতে পারি। আমাদেরকে অলৌকিক কাহিনী পড়ানো হয় যে কংস দৈববাণী পেয়েছিল যে দেবকীর গর্ভের সন্তান ই তাকে হত্যা করবে, এই কারণেই সে শিশুহত্যার মত জঘন্য পথ বেছে নিয়েছিল। আমরা আগেও দেখেছি প্রাচীন ভারতীয় শাস্ত্রসমূহে যেমন রামায়ণে যুদ্ধের পর মা সীতার চরিত্র চিন্তনেও শ্রী রামের মনের ভাবনা ও আমাত্যদের গোপন পরামর্শকে সেখানে দৈববাণী হিসেবে কাব্যরূপ দেয়া হয়েছে। এখানেও ঘটনা সম্ভবত তেমন ই।

মথুরার রাজা কংস তার পিতা উগ্রসেনকে বন্দী করে নিজেই জোরপূর্বক রাজা হন। অত্যন্ত অত্যাচারী হওয়ায় সবাই তার প্রতি বিরক্ত ছিল, সম্ভাবনা ছিল রাজদ্রোহের। উগ্রসেনের আপন ভাই, কংসের কাকা দেবক। তার কন্যা দেবকী। নিজের কাকাত বোন দেবকীকে ধুমধামের সহিত বিয়ে দিলেও এরমধ্যেই তার ষড়যন্ত্রকারী কোন সহায়ক আমাত্য তাকে আভাস দেয় যে কাকা দেবক বিদ্রোহীগণের সাথে দেবকীর সন্তানকে কেন্দ্র করে ভবিষ্যতে আশা বুনতে পারে এবং তাকে ক্ষমতা থেকে উৎখাতের চেষ্টা করতে পারে। রাজবংশের খুব ই সচরাচর দৃশ্য এটি। হরিবংশ ২.২২.২২ এ দেখা যায় কংসের কোন বিশ্বস্ত আমাত্য এবং চর ছিলনা, তার অত্যাচারে সবাই বিরক্ত ছিল, তিনি বলছেন

"অনামত্যস্য শুন্যস্য চরঅন্ধস্য মামৈব তু",

আমার কোন বিশ্বস্ত আমাত্য নেই, চর নেই, তাই চোখ থেকেও আমি অন্ধের ন্যায়।

হরিবংশ ২.২২.৪৬ এ আমরা দেখতে পাই কংস কৃষ্ণের পিতা বসুদেবকেও সন্দেহ করতেন কেননা বসুদেব ছিলেন অত্যন্ত বুদ্ধিমান, বলাবাহুল্য শ্রীকৃষ্ণও পিতা হতে এই গুণপ্রাপ্ত হয়েছিলেন। এই কারণেই কংস ভীত হয়ে পড়েছিল দেবকীর সন্তান নিয়ে, আর বিশ্বস্ত চরের অভাব, আমাত্যের অভাব এইসব দূর্বলতার সুযোগেই শিশু কৃষ্ণকে কারাগার হতে সরিয়ে ফেলা সম্ভব হয়েছিল বসুদেবের পক্ষে। অতএব কংস সিদ্ধান্ত নেন তাদেরকে বন্দী করার এবং কারাগারে কোন সন্তান জন্ম নিলে হত্যা করার। এবং ভবিষ্যতে তার আমাত্যদের এই আশংকা এবং তার মনের এই ভয় আসলেই সত্য হয়েছিল, শ্রীকৃষ্ণ ই তাকে বধ করে মথুরার ক্ষমতার পট পরিবর্তন করে দেন, মথুরার জনগণের জীবনে স্বস্তি ফিরে আসে।

এভাবেই ভাদ্রমাসের কৃষ্ণপক্ষের অষ্টমী তিথির অন্ধকার এক প্রবল বর্ষণের, বিদ্যুৎ চমকানোর দূর্যোগময় রাতে উত্তর প্রদেশের মথুরা নামক স্থানের এক কারাগারে জন্ম নেন শ্রীকৃষ্ণ,

অভ্যন্তরীণ সহযোগীদের মাধ্যমে তাকে অন্য একটি শিশু দিয়ে প্রতিস্থাপিত করে নিরাপদে সরিয়ে নেয়া হয় মথুরা হতে মাত্র ১০ কিলোমিটার দূরত্বে অবস্থিত গোকুল নামক স্থানের স্থানীয় সমাজপতি যাদব নন্দের ঘরে। জন্মের শুরুটাই প্রাসাদ রাজনীতি দিয়ে শুরু হয় যার তিনি পরবর্তী জীবনে ইতিহাসখ্যাত রাজনীতিবিদে পরিণত হবেন তাতে আর আশ্চর্য কি!
একটি তথ্য আমরা অনেকেই জানিনা যে এই গোকুল কিন্তু বৃন্দাবন নয়। শ্রীকৃষ্ণের বয়স যখন মাত্র ৩ বছর তখন নন্দ ও যশোদা গোকুল হতে ২৫ কিলোমিটার দূরে অবস্থিত বৃন্দাবনে গিয়ে নতুন বসতি স্থাপন করেন।
উল্লেখ্য যে তাঁর জন্মের সেই সময়কাল প্রত্নতাত্ত্বিক দৃষ্টিকোণ থেকে আজ হতে কম করে হলেও সাড়ে তিন হতে চারহাজার বছর আগের ঘটনা। বৃহস্পতি সিদ্ধান্তের গণনা অনুযায়ী যদিও তা ৫২৪৭ বছর পূর্বে।

এদিকে আমরা দেখতে পাই শ্রীকৃষ্ণ ও বলরাম অস্ত্রবিদ্যায় অতি পারদর্শী হয়ে উঠেন, তাঁরা নিয়মিত বৃন্দাবনে প্রভাবশালী চরিত্র হয়ে উঠছিলে, কংস নিজের প্রভাব কমে যাচ্ছে এই ভয়ে ভীত হয়ে পড়েন এবং নন্দ, তার দুই পুত্রসহ ব্রজবাসীকে মথুরায় আসার নিমন্ত্রণ দেন বার্ষিক করপ্রদান, যজ্ঞ ও ধনুক উৎসবকে কেন্দ্র করে **(হরিবংশ ২.২২.৮৬,৯১)**।
কংসের পরিকল্পনা ছিল শ্রীকৃষ্ণ ও বলরাম বালক হলেও কুস্তি খেলায় পারদর্শী ছিল এবং তাদেরকে কুস্তি খেলার আহবান জানালে তারা অবশ্যই অংশ নেবেন। এই সুযোগে বলবান দুইজন কুস্তি খেলোয়াড়ের মাধ্যমে এদের সাথে কুস্তি খেলাবেন, তাদের শক্তি পরীক্ষা করে দেখবেন এবং সুযোগ পেলে ছলনায় বধও করবেন। কংসের দূত অক্রুরের আমন্ত্রণে-

একাদশ সমাস্তত্র গুঢ়ার্চিঃ সবলৌৎবস

১১ বছর বয়সে শ্রীকৃষ্ণ তাঁর জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা বলরামের সাথে করে বৃন্দাবন ত্যাগ করলেন। (ভাগবতাম ৩.২.২৬)
বুঝতেই পারছেন পাঠকরা,বৃন্দাবন ত্যাগের সময় তিনি ছিলেন নিতান্তই ১১ বছরের বালক। অথচ আমরা হিন্দুরা তাঁকে ঘিরে রাধা নামক কাল্পনিক চরিত্রকে জড়িয়ে বৃন্দাবনে কত অশ্লীল, হাস্যরসাত্মক কাহিনী রচনা করেছি যেসবের কোন ভিত্তিই নেই।

সবচেয়ে রোমাঞ্চকর অংশ হল মথুরায় পৌঁছে ছদ্মবেশে তাঁরা কি কি করেছিলেন তার বর্ণনা। আমরা বিষ্ণুপর্বের ২৭ নং অধ্যায়ে দেখতে পাই কিভাবে এক ধোপার কাছ থেকে ছদ্মবেশে তাঁরা দামী রঙীন কাপড় চাইতে গেলে ধোপা তাদেরকে সন্দেহ করে এবং তখন বলপূর্বক তাঁরা সেই ধোপা হতে কাপড় সংগ্রহ করে। এরপর এক কুব্জা মহিলা হতে তাঁরা সুগন্ধি প্রসাধনী সংগ্রহ করেন এবং এক ফুল বিক্রেতা হতে মালা সংগ্রহ করে অভিজাত ব্যাক্তি সেজে কংসের প্রাসাদে প্রবেশ করেন ছদ্মবেশে। কিন্তু সেখানে ঘটে যায় এক অঘটন।

সেখানে রাখা ছিল ধনুক উৎসবের প্রতিযোগিতার জন্য এক বিখ্যাত অতি শক্তিশালী ধনুক। প্রহরী পোশাক আশাক দেখে শ্রীকৃষ্ণ ও বলরামকে দেখে অভিজাত রাজপুত্র মনে করেছিল বিধায় তাদেরকে ধনুকটি ধরতে দেয়। **হরিবংশ ২.২৭.৪৭** এ আমরা দেখতে পাই শ্রীকৃষ্ণ ও বলরাম চেয়েছিলেন ধনুকে তীর পরিয়ে দেখতে,কেবল পরীক্ষা করতে ধনুকটি কেমন। কিন্তু তাঁদের বাহুবল এতই অসাধারণ ছিল বাঁকাতে গিয়ে ধনুকটি ভেঙে যায়! প্রহরী হতবিহবল হয়ে পড়ে এবং তৎক্ষণাৎ কৃষ্ণ ও বলরাম সেখান থেকে পালিয়ে যান। এদিকে ভীত সন্ত্রস্ত প্রহরী দ্রুত রাজা কংসকে গিয়ে ঘটনাটি খুলে বলে।

এই অদ্ভুত খবর পেয়ে কংস ভাবলেন-

কথম বালো বিগতভিরবমত্য মহাবলম্
কারা এই মহাবলশালী বালকদ্বয়!
যস্যর্থে দারুণম কর্ম কৃতম্ লোকবিগর্হিতম্

এরাই কি সেই বালকদ্বয় যাদের হত্যা করার জন্য আমি এতদিন নানা গর্হিত কাজ করেছি! (হরিবংশ ২.২৮.২-৩)

বলা বাহুল্য যে কৃষ্ণ ও বলরামকে হত্যার অনেক চেষ্টা ই করেছেন এত বছরে কংস। তাই আজকে তার এই উপলব্ধি হল।

এই দুশ্চিন্তায় নিমগ্ন হয়ে কংস গেলেন পরেরদিনের উৎসবের ষড়যন্ত্রমূলক কুস্তিখেলার আসর পরিদর্শন করতে গেলেন, দেখে আসলেন সব ঠিকঠাক আছে কিনা (২.২৮.৬)। এরপর কংস তার আসল পাশার চাল খেললেন, ডাকলেন দুই মহাবলী চানূর ও মুষ্ঠিককে, বললেন-

তভ্যম যুধি নিরস্তভ্যম্ গোপাভ্যাম্ রঙ্গসন্নিধৌ।
অয়ত্যাম্ চ তদাত্বে চ শ্রেয়ো মম ভবিষ্যতি।।
(হরিবংশ,২.২৮.২৫)

অনুবাদ- এই, গোপবালক দুইটিকে কালকের ক্রীড়ায় বধ কর তোমরা,এতে আমার বর্তমান ও ভবিষ্যত উভয়ের ই উপকার হবে।

তবে ধুরন্ধর রাজা কংসের এটি ছিল প্ল্যান বি বা ব্যাকাপ প্ল্যান। তার আসল পরিকল্পনা ছিল অন্য, এমনভাবে দুই যাদব ভ্রাতাকে হত্যা করার পরিকল্পনা করলেন যেন সবাই মনে করে এটা দূর্ঘটনা।

তিনি কুবলয়াপীড় নামে একটি পাগলা হাতির ব্যাবস্থা করলেন। হস্তী দুটির মাহুতকে বললেন যদি কুস্তিক্রীড়ায় মৃত্যু না হয় তবে হাতিদুটোকে ওদের উদ্দেশ্য করে ছেড়ে দেবে, পিষ্ট করে মেরে ফেলবে ওদের।

বললেন-
“যাদবরা আমার পিতার ভক্ত যাকে আমি বন্দী করে রাজ্য দখল করেছি।এই দুই যাদবশ্রেষ্ঠকে হত্যা করতে পারলে যাদবদের আমার বিরুদ্ধে যাবার আর ক্ষমতা থাকবেনা,আমি নিশ্চিন্তে থাকব।”(২.২৮.৩০,৩৪,৩৬,৩৭)

উৎসবের প্রথম দিন অতিক্রান্ত হল, দ্বিতীয় দিনের উৎসব শুরু হল,সাজ সাজ রব। কুবলয়াপীড় হাতিটিকে নিয়ে তার মাহুত প্রবেশ করল অনুষ্ঠানস্থলে, যেই কৃষ্ণ ও বলরাম প্রবেশ করলেন সেখানে আগের ইংগিত অনুযায়ী পাগলা হাতিটিকে লেলিয়ে দেয়া হল তাদের হত্যা করতে।

কিন্তু যাদবরা ছিল পশুপালনে দক্ষ, তারা ভালো করে জানেন কিভাবে পশুকে বশ বা পরাজিত করতে হয়। কৌশলে তারা হাতিটিকে ভূমিতে ফেলে দিলেন এবং হাতিটির নিজের দাঁতদুটো দিয়েই হাঁতিটিকে আহত করে দিলেন, পরিণামে হাঁতিটি মারা গেল। উপস্থিত সকলে এই আকস্মিক দূর্ঘটনায় বিহ্বল হলেও হাতিটি পরাজিত হওয়া মাত্রই দুই বালকের বীরত্বে চারদিকে প্রচুর তালি বাজতে লাগল, সবাই প্রশংসাবৃষ্টিতে ভাসিয়ে দিল দুই ভাইকে। কংসের পরিকল্পনা অর্ধেক সফল হল, সবাই ভাবল এটি দূর্ঘটনা।

কৃষ্ণম ভৃশ্যাস্তমুখঃ সরোশম্ সমুদৈক্ষত..

কংসের মুখ বিবর্ণ হয়ে গেল দুইভাইয়ের এই বীরত্ব দেখে,রাগত দৃষ্টিতে তাকিয়ে রইলেন তিনি কৃষ্ণের দিকে।করতে থাকলেন পরবর্তী কর্মপরিকল্পনা,রণভূমিতে যুদ্ধ শুরুর আগে মনোভূমিতেই যুদ্ধের সূচনা হয়,আগামী পর্বে দেখব কি সুদূরপ্রসারী হয়েছিল এই যুদ্ধের পরিণাম যা বদলে দিয়েছিল ভারতভূমির ভবিষ্যৎ।

পাগলা হাতির দ্বারা পদপিষ্ট করে দুই ভাই শ্রীকৃষ্ণ ও বলরামকে হত্যাপূর্বক তাকে দূর্ঘটনা বলে চালিয়ে দেবার ষড়যন্ত্র ব্যার্থ হল। ধূর্ত কংস পরবর্তী চাল আগে থেকেই ঠিক করে রেখেছিলেন। দুই শক্তিশালী কুস্তি খেলোয়াড় চানূড় আর মুষ্টিকাকে আগে থেকেই ঠিক করে রেখেছিলেন কুস্তিক্রীড়ায় শ্রীকৃষ্ণ ও বলরামকে বধ করতে।
সেই পূর্বপরিকল্পনা অনুযায়ী ই চানূর শ্রীকৃষ্ণকে ও মুষ্ঠিক বলরামকে কুস্তিক্রীড়ার আহ্বান

জানালেন।কিন্তু প্রতিযোগিতায় খেলার নিয়ম ঠিক করে দেয়া ছিল আগে থেকেও-

১) লড়াই হবে কেবল খালি হাতে, কোন অস্ত্র দ্বারা নয়
২) একজন যোদ্ধা একইসময়ে কেবল একজনের সাথেই লড়াই করতে পারবেন, একাধিকজন মিলে একজনকে আক্রমণ করা যাবেনা।
৩) যোদ্ধা একজন বালক হোক, বৃদ্ধ হোক, মধ্যবয়সী হোক, স্বাস্থ্যবান হোক বা কৃশকায়, যুদ্ধ দুইজন সমান সমান ধরনের লোকের মধ্যে হতে হবে।
৪) এক যোদ্ধাকে অপর যোদ্ধা পরাস্ত করে ভূমিতে ফেলে দিলে সে বিজ্ঞ ব্যক্তির তাকে আর কিছু করা উচিত নয়।
(হরিবংশ ২.৩০.১২,১৪)

এখানে লক্ষ্যণীয় যে ভাগবত পুরাণ অনুসারে ১১ বছর বয়সে কৃষ্ণ মথুরা ত্যাগ করেন। আবার হরিবংশে কুস্তিলড়াইয়ের নিয়মে বলা হচ্ছে সমান সমান ধরনের যোদ্ধা ই কেবল লড়াই করতে পারবে। তাহলে একজন বালক শ্রীকৃষ্ণ কিভাবে শক্তিশালী কুস্তিযোদ্ধা চানূড়ের সমান? হরিবংশ লেখকের প্রশ্ন-

বালাঃ কৃষ্ণো মহানন্ধ্রঃ কথম্ ন স্যাদ্বিচারণা
কেন আমরা ভাবছি কৃষ্ণ এক বালক আর অন্ধ্রের যোদ্ধা(চানূড়) মহাবলী?
(হরিবংশ ২.৩০.১৭)

এরকম দুইজনের তো যুদ্ধ করার কথা নয়, তাহলে কেন এই লড়াই হল? এরকম প্রশ্ন সেখানেও উঠল। একজন বালক কি করে চানূড়ের সাথে লড়াই করবেন? কারণ ছিল শ্রীকৃষ্ণ স্বেচ্ছায় এই লড়াইয়ে অংশ নিয়েছিলেন বালক হওয়া সত্ত্বেও। তিনি তাঁর নিজের শক্তি ও কৌশল সম্বন্ধে নিশ্চিন্ত ছিলেন। তিনি বললেন-

"আমি একজন বালক, আর এই কুস্তিবিদ বলশালী পর্বতের ন্যায়, তবে আমি এই বলশালীর সাথে যুদ্ধে রাজি। আমি কদাপি লড়াইয়ের নিয়ম ভঙ্গ করবনা, খালি হাতের যোদ্ধাদের খ্যাতি আমি সমুন্নত রাখব।"
(হরিবংশ ২.৩০.১৯-২০)

কিন্তু চানূর ছিলেন অতি ধূর্ত যোদ্ধা, হরিবংশ বলছে সে অনেক যুদ্ধেই নিয়ম ভঙ্গ করে প্রতিযোগীকে হত্যা করত, শ্রীকৃষ্ণের সাথেও সে তাই করতে চলেছিল। ফলে বাধ্য হয়ে শ্রীকৃষ্ণ ও বলরাম যথাক্রমে চানূর ও মুষ্ঠিককে বধ করলেন।

এই ঘটনা অবলোকন করে কংস ক্রোধে অধীর হলেন, শ্রীকৃষ্ণের পালক পিতা নন্দসহ কৃষ্ণ ও বলরামকে গ্রেফতারের আদেশ দিলেন, সকল বৃন্দাবনবাসীর সপত্তি জব্দ করার নির্দেশ দিয়ে তিনি শীঘ্রই নন্দ, কৃষ্ণ ও বলরামকে মৃত্যুদণ্ড দেয়ার কথা ঘোষণা করলেন।ভীষণ ভাষায় তিনি নন্দ ও বসুদেবকে গালাগাল করতে লাগলেন। পিতার এহেন অপমান ও বৃন্দাবনবাসীর উপর চাপিয়ে দেয়া অত্যাচার দেখে শ্রীকৃষ্ণ অত্যন্ত ক্ষিপ্ত হলেন। তখন তিনি এক লাফে কংসের উপবিষ্ট আসনের সামনে গেলেন এবং চুলের মুষ্ঠি ধরে কংসকে বধ করলেন।কংসের পিতামাতা মুক্ত হলেন,ধার্মিক উগ্রসেন পুনরায় রাজা হলেন, মথুরায় শান্তি ফিরে এল।

এখানে কিছু বক্তব্য প্রকাশ না করলেই নয়। ভাগবত পুরাণ অনুযায়ী এ সময় শ্রীকৃষ্ণের বয়স ছিল ১১ বছর।এই তথ্যটি অবশ্যই সঠিক এরকম বলা কঠিন। কেননা আগেই আমরা বিশেষজ্ঞদের মাধ্যমে দেখেছি যে পুরাণ সমূহে খ্রিষ্টীয় প্রথম শতকের পর হতে ৭ম-৮ম শতক

পর্যন্ত প্রচলিত লোকাচার এর ভিত্তিতে শ্রীকৃষ্ণের উপর দিব্যত্ব আরোপ করার একটি সংস্কৃতি গড়ে উঠে কবিদের মধ্যে।হরিবংশের Critical Edition এ BORI কর্তৃক লেখা সুদীর্ঘ ভূমিকাতেই আমরা তা দেখতে পাই। শ্রীকৃষ্ণের বয়স যত কম দেখানো সম্ভব, তাঁকে যত কৃশকায় দেখানো সম্ভব ততই তাঁর এই বিজয়কে অলৌকিক দেখানো সম্ভব। এই কারণে তাঁর বয়স ১১ ই ছিল কিনা তা নিয়ে বিতর্ক রয়ে যায়। তবে এখানে স্মরণ রাখতে হবে যে হরিবংশ সহ সবগুলো পৌরাণিক উৎসেই তখন তাকে যুবকের ন্যায় অতুল্য পেশীশক্তির অধিকারীও বলা হয়েছে।

এখানে খুব গুরুত্বপূর্ণ আরেকটি লক্ষণীয় ব্যাপার হল কংসকে বধের পর তাঁরা মথুরাতেই বসবাস করছিলেন। এতদিন নন্দালয়ে শারীরিক কসরত শিখলেও সেখানে বসবাসরত অবস্থাতেই তাঁরা দুইজন প্রথম কাশীতে অবস্থিত সন্দিপনী মুনির আশ্রমে যান এবং সেখানে ধনুক ও শস্ত্রবিদ্যা লাভ করেন (হরিবংশ ২.৩৩.৪)।

মহাভারতের আদিপর্বের সম্ভব পর্বাধ্যায়ে আমরা দেখতে পাই কৌরব ও পাণ্ডবরা নিজগৃহে অন্যান্য বিদ্যা লাভের পর ১৬ বছর বয়স অতিক্রান্ত হলে অস্ত্রগুরু দ্রোণাচার্যের কাছে শস্ত্রবিদ্যা শিক্ষালাভের নিমিত্তে যান। তৎকালীন ক্ষত্রিয়দের এই ছিল নীতি। আবার শ্রীকৃষ্ণ ছিলেন অর্জুনের সমবয়সী। সেকালের সমসাময়িক ক্ষত্রিয়দের এই নিয়ম চিন্তা করলে বুঝা যায় তখন শ্রীকৃষ্ণের

বয়স ১৬ অতিক্রম করেছিল, বলরামের আরও বেশী। তাই ১১ বছরের যে ভাগবত পুরাণপন্থী সেই উৎসটি তা সঠিক কিনা সন্দেহ থেকে যায় বরং পরবর্তী তথ্যটিই অধিকতর গ্রহণযোগ্য মনে হয়।

কংসের অধ্যায় তো শেষ হল, কিন্তু শ্রীকৃষ্ণের ও মথুরার যাদবদের জীবনে এই কংস মৃত্যুর পরেও অশেষ দূর্দশা নিয়ে আসল।কিভাবে? মন্ত্রী, সংসদ সদস্যসহ ক্ষমতাশালীদের ছেলে, মেয়ে, ছেলের বৌ, মেয়ের জামাই এদের সাথে কেউ সাধারণত হাঙ্গামা করতে যায়না, কারণ এতে অশেষ দুর্ভোগই প্রাপ্তি হয়। কংস ছিলেন তেমন ই এক অতি ক্ষমতাশালীর জামাতা, তিনি ছিলেন তৎকালীন ভারতবর্ষের সবচেয়ে ক্ষমতাশালী দুই রাজবংশের একটি তথা মগধের রাজা জরাসন্ধ। কে এই জরাসন্ধ? প্রাচীন ভারতবর্ষের ১৬ টি মহাজনপদের একটি ছিল মগধ যা বর্তমান ভারতের বিহার, পাটনা,গয়াসহ তৎসংলগ্ন বিশাল অঞ্চল নিয়ে গঠিত ছিল আর এর একচ্ছত্র অধিপতি ছিলেন কংসের শ্বশুর জরাসন্ধ।

অপর শক্তিশালী সাম্রাজ্যটি ছিল কুরু সাম্রাজ্য। আর মহাবীর এবং বুদ্ধ পরবর্তী সময়েও এই মগধ ছিল ভারতের চারটি বৃহত্তম শক্তির একটি। বুঝতেই পারছেন যে কোন গোষ্ঠীর শক্তি ও নিরাপত্তার মূল একটি নির্ণায়ক ছিল মগধের ও কুরুরাজ্যের সাথে তাদের সম্পর্ক। আর সেইদিকেই শ্রীকৃষ্ণ বিশাল বিপদে পড়ে গেলেন। ভোজ,বৃষ্ণি ও অন্ধকদের (যাদবদের তিনটি উপদল, শ্রীকৃষ্ণ ছিলেন বৃষ্ণিদলের) সমর্থন পেয়ে উগ্রসেন আবার রাজা হলেন ঠিক ই কিন্তু-

জিঘাংসুর্হি যদুন্ক্রুদ্ধঃ কংসস্যাপচিতিম্ স্মরণ।
জামাতা কংসের মৃত্যুর কথা শুনে জিঘাংসায়
ক্রোধন্মত্ত হলেন মগধের রাজা জরাসন্ধ।
(হরিবংশ ২.৩৪.৫)

কালবিলম্ব না করে বিশাল সৈন্যবাহিনী নিয়ে উপস্থিত হলেন মথুরা আক্রমণ করতে।আর

একা এলেন না, সাথে নিয়ে এলেন-

১) মধ্যপ্রদেশের করূশ রাজবংশের রাজা দন্তবক্র (শিশুপালের কাকাত ভাই), সাথে চেদিরাজ শিশুপাল ও কাশিরাজ কৌশল্য। উল্লেখ্য যে চেদি সাম্রাজ্যের দক্ষিণে ছোট একটি রাজ্য ছিল করূশ, করূশরা নিজেরাও যাদবদের একটি উপশাখা ছিল, কিন্তু তারা সর্বদাই ছিল চেদি সাম্রাজ্যের প্রতি অনুগত। মধ্য প্রদেশ ও উত্তর প্রদেশের লাগোয়া তিনটি রাজ্য চেদি,করুশ ও কাশি, এই তিনটি মগধের পক্ষে ছিল। পরবর্তীতে আমরা দেখব কিভাবে অসামান্য কূটনীতিবিদ শ্রীকৃষ্ণ এই তিনটি রাজ্যকে কুরুক্ষেত্র যুদ্ধে পাণ্ডবদের পক্ষে নিয়ে এসেছিলেন।
২) কলিঙ্গের রাজা(উড়িষ্যা ও অন্ধ্র প্রদেশের অংশবিশেষ)
৩) সাথে শ্রীকৃষ্ণের ভবিষ্যৎ সহধর্মিণী রুক্মিনীর ভ্রাতা, ভিষ্মকরাজের পুত্র রুক্মী। এছাড়াও আরও বেশকিছু রাজা।
(হরিবংশ ২.৩৪.১৩-১৫)

সম্মিলিত এই বিশাল সৈন্যবাহিনী নিয়ে মথুরার সীমান্তের বনমধ্যে তারা সেনাক্যাম্প স্থাপন করলেন। তারা সম্পূর্ণ মথুরাকে ঘিরে ফেলল। **(হরিবংশ ২.৩৫.১,২৫)**
এতবেশী তাঁবু হয়েছিল যেন মনে হচ্ছিল শ্বেতসমুদ্র।পরদিন সকালে যুদ্ধ শুরু হল।
যাদবরা সংখ্যায় কম হলেও অতি বীরত্বের সাথে যুদ্ধ করল **(হরিবংশ ২.৩৫.৫৩)**

প্রচণ্ড যুদ্ধ হতে লাগল,বলরাম ও জরাসন্ধের মধ্যে গদাযুদ্ধও হল, কেউ কাউকে হারাতে পারলেন না। দুইজন ই আহত হলেন একে অপরের হাতে। যাদবদের সংখ্যা কম হওয়ায় ধীরে ধীরে তাদেরকে আতংক গ্রাস করতে থাকল।

সৃজন্তঃ শরবর্ষাণি সম্ভিত্যাক্তজীবিতঃ
(২.৩৫.১০৫)
জীবনের আশা ক্ষীণ দেখে যাদবরা প্রাণপণে শরবর্ষণ করতে লাগল।

এভাবে ৮ দিন ব্যাপী যুদ্ধ চলল। যাদবরা সংখ্যায় কম হলেও প্রাণপণে যুদ্ধ করে প্রবল পরাক্রম দেখাল এবং এইবারের মত জরাসন্ধকে আঁটকে দিতে সমর্থ হলে। এই যাত্রায় বেঁচে গেল মথুরা। কিন্তু যাদবরা জানতেন-
জরাসন্ধম্ তু তে জিত্ব মেনিরে নৈব নির্জীতম্
জরাসন্ধকে এবার কোনরকমে আঁটকানো গেছে,কিন্তু এভাবে কতদিন?

একের পর এক-
দশশ্চষ্টতৌ চ সংগ্রামঞ্জরাসন্ধস্য যাদবঃ
১৮ বার এভাবে জরাসন্ধ ও যাদবদের মধ্যে যুদ্ধ হল।

অল্পত্বদভিভুতস্তু বৃষ্ণয়ো ভারতর্ষভ।
বর্হদ্রথেন রাজেন্দ্র রাজভিঃ সহিতেন বৈ।।
(হরিবংশ ২.৩৬.৩৯)
এভাবে যুদ্ধ করতে করতে তুলনামূলক কম শক্তির অধিকারী যাদবরা ক্লান্ত,দূর্বল হয়ে পড়ল।

তারা একপর্যায়ে বুঝতে পারলেন-
বহুলপি চ সৈন্যানি হন্তুম বর্ষ শতৈরপি
(হরিবংশ ২.৫৫.৯৯)
জরাসন্ধের সৈন্যসংখ্যা এতই বৃহৎ যে তাদের ১০০ বছরেও পরাজিত করা সম্ভব নয়-
তাই-
ব্রভিমি মথুরম্ পুরীম্ বসতোরাভয়োঃ শ্রেয় ন ভবেদিতি।
এই মথুরায় আমাদের আর থাকা নিরাপদ হবেনা।

মহাভারতেও পরবর্তীকালে পাণ্ডবদের সাথে কথোপকথনে শ্রীকৃষ্ণ একই কথা বলেছিলেন-
ন হন্যামো বয়ং তস্য ত্রিভির্বর্ষশতৈর্বলম্॥
(মহাভারত২.১৪.৩৮)
অনুবাদ-আমরা যাদবরা তিনশ বছর যুদ্ধ করলেও অজেয় জরাসন্ধকে হারাতে পারবনা।

অষ্টাদশ ময়া তস্য সঙ্গ্রামা রোমহর্ষণাঃ।
(মহাভারত,২.১৪.৪২)

অনুবাদ-জরাসন্ধ আমাদের ১৮ বার ভীষণ আক্রমণ করেন,আমরা অনেক সংগ্রাম করে বেঁচে ছিলাম।

পলায়ামো ভয়াত্তস্য সসুতজ্ঞাতিবান্ধবাঃ।
ইতি সঞ্চিন্ত্য সর্বে স্ম প্রতীচীং দিশমাশ্রিতাঃ॥
(মহাভারত ২.১৪.৫২)

অনুবাদ-টিকে থাকা অসম্ভব দেখে দিশেহারা হয়ে আমরা ভয়ে পালিয়ে গেলাম।

কুশস্থলীং পুরীং রম্যাং রৈবতেনোপশোভিতাম্।
ততো নিবেশং তস্যাং চ কৃতবন্তো বয়ং নৃপ॥
(মহাভারত ২.১৪.৫৩)

অনুবাদ-পালিয়ে আমরা রৈবতক পর্বত দিয়ে ঘেরা কুশস্থলীতে আশ্রয় নিলাম এবং প্রাচীন দূর্গসমূহ সংস্কার করে সেখানেই বসতি স্থাপন করলাম।

আর এই কুশস্থলী ই বর্তমান গুজরাটের দ্বারকা। তিনদিকে পর্বতশ্রেণী আর একপাশে সমুদ্র দিয়ে ঘেরা, ভৌগলিকভাবে সবচেয়ে নিরাপদ এমন একটি স্থান ই যাদবদের নতুন রাজ্য নির্মাণের জন্য বেছে নিলেন তিনি। নিজেদের জন্মস্থান মথুরা ছেড়ে প্রায় ১২০০ কিলোমিটার দূরের দ্বারকায় এসে বসতি গড়লেন নতুন জীবনের আশায়। মধ্য প্রদেশের কৃষ্ণ এখন হলেন গুজরাটের অধিবাসী, অবশ্য পুরো ভারতবর্ষের ই প্রাণ যিনি তাঁর মথুরাই কি, গুজরাটই বা কি।

হরিবংশের বিষ্ণুপর্বের ৫৮ নং অধ্যায়ের পুরোটিই নতুন দ্বারকা নগরী নির্মাণের বর্ণনা। কামার, কুমোর, রাজমিস্ত্রী সহ সকল যাদবরা দিনরাত পরিশ্রম করতে লাগলেন নতুন নগরী প্রতিষ্ঠার জন্য। শ্রীকৃষ্ণ বিভিন্ন রাজ্যের শ্রেষ্ঠ প্রকৌশলীদের নিয়ে আসার জন্য দূত প্রেরণ করলেন নগর নির্মাণার্থে-

প্রেশ্যন্তম শিল্পীমূখ্যাণাম্ যুক্তাণাম্
বেশমকর্মসু।
(হরিবংশ ২.৫৮.১০)

যাও,তোমরা শ্রেষ্ঠ প্রকৌশলীদের খবর দিয়ে নিয়ে এসো নগর নির্মাণের জন্য।

কেমন ছিল সেই দ্বারকা নগরী? শ্রীকৃষ্ণের ভাষায়-

ত্রিয়োজনায়তং সদ্ম ত্রিস্কন্ধং যোজনাবধি॥
(মহাভারত সভাপর্ব ২.১৪.৫৭)

অর্থাৎ রৈবতক পর্বতমালা প্রায় ৩৯ কি.মি দীর্ঘ, ১৩ কি.মি. প্রশস্ত।

যোজনান্তে শতদ্বারং বীরবিক্রমতোরণম্।
অষ্টাদশাবরৈর্নদ্ধং ক্ষত্রিয়ৈর্যুদ্ধদুর্মদৈঃ॥
অষ্টাদশ সহস্রাণি ভ্রাতৃণাং সন্তি নঃ কলে।
(মহাভারত, ২.১৪.৫৮,৫৯)

নগরে ঢুকতে মোট ১০০ টি প্রবেশপথ রাখা হল এবং প্রতিটি দ্বারে কড়া পাহারার ব্যবস্থা করা হল।১৮০০০ শক্তিশালী ক্ষত্রিয়ের মাধ্যমে গড়ে তোলা হল সেনাবাহিনী।আর এই অসংখ্য প্রবেশ দ্বারের কারনেই এর নাম হয়েছিল দ্বারকা বা দ্বারের নগরী।মূল ফটক ছিল চারটি।

হরিবংশ ২.৫৮.১০ এ আমরা দেখতে পাই শ্রীকৃষ্ণ নির্মাণশিল্পীদের বলছেন নগরীতে পর্যাপ্ত ঘর, প্রাসাদ, হাইওয়ে রোড এসবের ব্যাবস্থা রাখতে। ২.৫৮.৩৩ এ আমরা দেখতে পাই পানি নিষ্কাশন ব্যাবস্থা রাখার কথা বলছেন শ্রীকৃষ্ণ।

চারুদেষ্ণঃ সহ ভ্রাত্রা চক্রদেবোঽথ সাত্যকিঃ।
অহং চ রোহিণেয়শ্চ সাম্বঃ প্রদ্যুম্ন এব চ॥
(মহাভারত ২.১৪.৬০)

তিনি,তাঁর ভাই বলরাম, সাত্যকি,শাম্ব,চারুদেষ্ণ,চক্রদেব,চক্রদেবের ভাই এই ৭ জন মিলে রইলেন সেনাবাহিনীর প্রধান দায়িত্বে।

হরিবংশ ২.৫৬.২৯ এ এও বলা হয়েছে দ্বারা বা দাবার বোর্ড এর মত চারকোণা আয়তনের ছিল বলে এর নাম ছিল দ্বারাবতী যা পরবর্তীতে দ্বারকা নামে প্রসিদ্ধ হয়। আপনারা নিশ্চয় জানেন দাবা খেলা তথা চতুরঙ্গের উৎপত্তি কিন্তু ভারতবর্ষেই!

হরিবংশ ২.৫৮.১৮ তেও দ্বারকা নগরীকে দূর্ভেদ্য করতে শ্রীকৃষ্ণের তত্ত্বাবধানে শহরের চারপাশে তৈরীকৃত দেয়ালের দূর্গের কথা বলা হয়েছে।

পরবর্তীতে কালের আবর্তে শ্রীকৃষ্ণের তিরোধানের পর এই নগরীটি সাগরের নিচে বিলীন হয়ে যায় যা মহাভারতের মৌষল পর্বে স্পষ্ট উল্লেখিত রয়েছে।

দ্বারকাং রত্নসংপূর্ণাং জলেনাপ্লাবয়ত্তদা॥
(মৌসলপর্ব, ১৫.৮.৪২)
অতঃপর রত্নসম্ভার সমৃদ্ধ দ্বারকা নগরী সমুদ্রের জলের নিচে মিলিয়ে গেল।

মজার বিষয় হল দ্বারকা নগরীতে যেন কোন শত্রু ঢুকে পরতে না পারে সেজন্য ব্যবস্থা ছিল আইডি কার্ডেরও ! ১৯৮৩ সালে ভারতের National Institute of Oceanography এর তত্ত্বাবধানে গুজরাটের যে স্থানে মহাভারতের দ্বারকা অবস্থিত ছিল সেই স্থানে কচ্ছ উপসাগরের নিচে প্রত্নতাত্ত্বিক অনুসন্ধান চালান আর খুঁজে পান অসম্ভব সমৃদ্ধ সভ্যতাবিশিষ্ট ১৫০০ খ্রিষ্টপূর্বের শ্রীকৃষ্ণের সেই দ্বারকা নগরী যা অনেক অবিশ্বাসীরা এতদিন শুধুই গল্প বলে মনে করে আসছিল। আর সেই অনুসন্ধানে পাওয়া যায় তিন প্রাণীর মাথা খোদাই কটা বিশেষ একধরনের মুদ্রা যা একমাত্র দ্বারকার নাগরিকদেরকেই দেয়া হত, শহরের যে কোন দ্বার দিয়ে প্রবেশ করতে হলে সেই মুদ্রাটি আইডি কার্ড হিসেবে দ্বাররক্ষকদের দেখাতে হত, কেবল তাতেই মিলত নগরীতে প্রবেশের অনুমতি। আজ থেকে প্রায় ৪০০০ বছর পূর্বেই মহান এই রাজনীতিবিদ কত আধুনিক ব্যবস্থা নির্মান করেছিলেন রাজ্য রক্ষায়। আজকের হিন্দুরা তাঁর ভক্ত হবার নাম করে নাচ, গান আর প্রসাদ ভোজনের নামে উদরপূর্তি ও স্বস্তা বিনোদনের নেশায় মত্ত। সেই মহান প্রজ্ঞাবান,দূর্ধর্ষ যোদ্ধা, রাজনীতিবিদ,শ্রেষ্ঠ কূটনৈতিক রাজন্য,বীরদের মধ্যে বীরশ্রেষ্ঠ যোগেশ্বর শ্রীকৃষ্ণ থেকে আমরা শিক্ষা নিয়েছি কি?

শ্রীকৃষ্ণের অসামান্য রাজনৈতিক মেধার বর্ণনায় যুধিষ্ঠির বলেছিলেন-

অন্ধং বলং জড়ং প্রাহুঃ প্রণেতব্যং বিচক্ষণৈঃ॥
যতো হি নিম্নং ভবতি নয়ন্তি হি ততো জলম্।
যতশ্ছিদ্রং ততশ্চাপি নয়ন্তে ধীবরা জলম্॥
তস্মান্নয়বিধানজ্ঞং পুরুষং লোকবিশ্রুতম্।
বয়মাশ্রিত্য গোবিন্দং যতামঃ কার্যসিদ্ধয়ে॥
এবং প্রজ্ঞানয়বলং ক্রিয়োপায়সমন্বিতম্।
(মহাভারত ২.২০.১৬-২০)

অনুবাদ-প্রাজ্ঞ নেতা ছাড়া সৈন্যদল যেকোন কিছুর মতই অধম। এমনকি জেলেও মাছ ধরতে গেলে ছিদ্র দিয়ে জল উঠতে পারে কিনা তা খেয়াল করে (অর্থাৎ বুদ্ধিমান নেতা নিজের শক্তি ও শত্রুপক্ষের দূর্বলতা বুঝেই কাজ করে), আর এই বুদ্ধিমত্তার জন্যেই শ্রীকৃষ্ণের রাজন্যপ্রজ্ঞার খ্যাতি সারা বিশ্বের মুখে মুখে।তাই যদি কোন কার্যে সফল হতে চাও তবে শুধু গোবিন্দকে নেতা বানিয়ে তাঁর প্রজ্ঞা ও কর্মের অনুসরণ কর,তবেই দেখবে সাফল্য নিশ্চিত!

প্রাচীন গ্রীসের ইতিহাসে শ্রীকৃষ্ণ

গবেষণা পরিষদ, বাংলাদেশ অগ্নিবীর

মেগাস্থিনিসকে চেনেন না এমন মানুষ খুব ই কম আছেন,বিখ্যাত গ্রীক ইতিহাসবিদ এবং পর্যটক।খ্রিষ্টপূর্ব ৩২৬ সালে আজ থেকে প্রায় ২৩৫০ বছর পূর্বে আলেক্সান্ডার ভারত আক্রমন করলেন,তৎকালীন ভারতের (আজকের পাকিস্তান) পাঞ্জাবের ঝিলুম নদীর তীরে (এই নদীর গ্রীক নাম হিডেসপিস) সংগঠিত হল বিখ্যাত Battle Of Hydespes বা হিডেসপিসের যুদ্ধ, পরাজিত হলেন রাজা পুরু, অবশ্য এর মাত্র ১১ বছরের মধ্যেই খ্রিষ্টপূর্ব ৩১৫ সালে অখণ্ড ভারতবর্ষের রাজা চন্দ্রগুপ্ত মৌর্য পুনরায় গ্রীকদের তাড়িয়ে মুক্ত করলেন ভারতকে। সেই মৌর্য সাম্রাজ্যের সময়ে ভারতে এলেন মেগাস্থিনিস,লিখলেন ইন্ডিকা নামের ইতিহাসখ্যাত বই। আপনারা ভাবছেন কেন এত কথা বলছি। তার কারন আছে।আপনারা জেনে থাকবেন গ্রীকরা সবকিছুকেই নিজেদের ভাষায় নামকরণ করতেন, যেমন আগেই বললাম ঝিলুম নদীর নাম ছিল হিডেসপিস, সিন্ধু নদের তীরের হিন্দুস্থানের নাম ছিল ইন্ডিকা। ঠিক তেমনি মেগাস্থিনিস তাঁর বইয়ে লিখে গিয়েছিলেন এমন একজন বিখ্যাত পুজনীয় ব্যাক্তির কথা।

তিনি হলেন হেরাক্লেস (Herakles)। শুধু মেগাস্থিনিস ই নয়, তাঁর পরে অপর তিনজন বিখ্যাত গ্রীক ইতিহাসবিদও বলে গিয়েছিলেন Herackes এর কথা, তাঁরা হলেন Arrian of Nicomedia, Diodorus Siculus এবং রোমান ইতিহাসবিদ Strabo।

যুক্তরাষ্ট্রের Rutger's University এর ভারতীয় ধর্মবিষয়ক বিভাগের অধ্যাপক Edwin Bryant বলছেন-

"মেগাস্থিনিস, আরিয়ান, ডায়োডরাস, স্ট্র্যাবো বর্ণনা দিয়েছেন ভারতের এক গোত্র সৌরসেনয় এর যাদের কাছে Herakles পূজিত ছিল, তাদের বিখ্যাত দুইটি নগরী ছিল Methora এবং Kleisbora আর একটি নদী Jobares।এ নিয়ে কোন সন্দেহ ই নেই যে সেই Herakles ছিলেন কৃষ্ণ, Methora হল মথুরা, Kleisbora হল কৃষ্ণপূর তথা বৃন্দাবন, Jobares হল কৃষ্ণের স্মৃতিবিজড়িত যমুনা নদী।"

(Krishna: a sourcebook, Edwin Francis Bryant, Oxford University Press US, 2007)

আরও অবাক করার মত বিষয় হল আজ থেকে প্রায় ২১০০ বছর আগে খ্রিষ্টপূর্ব প্রথম শতকে রোমান ইতিহাসবিদ Quintus Curtius আলেক্সান্ডার আর রাজা পোরুর যুদ্ধের বর্ণনায় লিখেছিলেন যে রাজা পোরুর সৈন্যদের হাতে ছিল Herakles এর ছবি যা নিয়ে তাঁরা যুদ্ধ করতে এসেছিপ। এ থেকে বোঝা যায় সেই সময়েও শ্রীকৃষ্ণ বীর যোদ্ধাদের কাছে কতটা প্রিয় ছিলেন। রাজা পোরুর সৈন্যসংখ্যা অনেক কম হলেও আলেক্সান্ডার তার বীরত্বে এতই মুগ্ধ হয়েছিলেন যে পোরু হেরে গেলেও তার রাজ্য

দখল তো করেন ই নি বরং তাকে সিন্ধু নদী অঞ্চলের আরও কিছু রাজ্য চালনার ভার দিয়েছিলেন। রাজা পোরু আর আলেক্সান্ডার দ্যা গ্রেট এর কথোপকথন আজও ছেলেমেয়েরা পাঠ্যবইয়ে মুগ্ধতার উপাখ্যান হিসেবে পড়ে থাকে।

ছবিতে দেখতে পাচ্ছেন একটি Painting, এর নাম A Pastoral Scene, খ্রিষ্টীয় দ্বিতীয় শতকের ছবিটি গ্রীসের এথেন্স হতে ৬০ কি.মি দূরে Corinth নামক জায়গায় প্রত্নতাত্ত্বিক খননে পাওয়া গিয়েছিল। ছবিতে দেখতেই পাচ্ছেন Herakles কে,বাঁশির সুরে মাতাচ্ছেন এক রাখাল,তার পিছনে তার প্রিয় প্রাণীরা নিশ্চিন্তে চড়ে বেড়াচ্ছে। নিশ্চয় বুঝতে পারছেন কার সাথে একদম মিলে গেছে!

শ্রীকৃষ্ণের বাল্যবিবাহ !

শাস্ত্রার্থ ন্যাস, বাংলাদেশ অগ্নিবীর

সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যম এখন বাল্যবিবাহের বিভিন্ন অর্ধসত্য ও মিথ্যা তথ্যে সয়লাব। সে প্রসঙ্গেই চলে আসে প্রাচীন ভারতে বাল্যবিবাহ প্রথা চালু হলো কবে থেকে সে বিষয়ক সমাচার। আর একই ধারায় চলে আসে শ্রীরাম ও শ্রীকৃষ্ণের বিয়ের প্রসঙ্গও। গতদিন আমরা দেখেছি বিয়ের সময় শ্রীরাম ও মাতা সীতার বয়স ছিল সর্বনিম্ন ২৪ ও ১৭ বছর। আজ আমরা দেখব বিয়ের সময় শ্রীকৃষ্ণ দম্পতির বয়সের বিষয়টি।

উল্লেখ্য যে বাল্যবিবাহ এমন একটি প্রথা যেখানে বর ও কনে উভয় ই বালক- বালিকা থাকেন। এক্ষেত্রে মূলত অভিভাবকদের উদ্যোগেই বিয়ের প্রক্রিয়াটি হয়ে থাকে। পাত্র ও পাত্রী অল্পবয়স্ক হওয়াতে তাদের মতের গুরুত্ব বা প্রয়োজনীয়তা সেখানে অনুপস্থিত। এমনকি ১০০ বছর আগেও আমরা দেখি উপমহাদেশে হিন্দু মুসলিম উভয় সমাজেই প্রচুর বাল্যবিবাহ হতো। বিদ্যাসাগর থেকে বঙ্গবন্ধু সকল ব্যক্তির জীবনেই এই বিষয়টি দেখা যায়। পাশাপাশি আরেক ধরনের বিয়ের প্রচলন সমাজে দেখা যেতো এবং আজও হয়তো কিছু কিছু ক্ষেত্রে দেখা যায় যেখানে সামাজিক ও অর্থনৈতিক প্রভাব প্রতিপত্তি ব্যবহার করে অনেক বয়স্ক পুরুষরা অল্প বয়স্কা বালিকা মেয়েদের বিয়ে করত। বিদ্যাসাগর বা বঙ্গবন্ধুদেরকে সেই পর্যায়ে ফেলার সুযোগ নেই কেননা তাঁদের বিয়ের সময় বরকনে উভয়েই কমবয়স্ক ছিলেন অর্থাৎ এখানে পাত্রপাত্রীকে দোষের দৃষ্টিতে দেখার সুযোগ নেই এবং সেক্ষেত্রে বয়সের ব্যবধানটি দৃষ্টিকটু নয়।

আবার তাঁরা নিজ নিজ কর্মক্ষেত্রে প্রাতঃস্মরণীয় হলেও তাঁদেরকে কেউই সর্বকালের সর্বযুগের শ্রেষ্ঠ মহামানব দাবী করা হয়না, সকল মানবের জীবন আদর্শ বলে তাদের নাম প্রচার করা হয়না। তাঁরা কেবলই নিজ নিজ কর্মক্ষেত্রে সেরা যাঁরা জীবনের অনেক বিষয়েই স্ব স্ব সময়ের সমাজের গণ্ডীর বাইরে যেতে পারেন নি। তাই তাঁদেরকে উদাহরণ হিসেবে ব্যবহার করে অপ্রাপ্তবয়স্ক ছেলেমেয়ের বিয়ে দেয়াকে নৈতিক বৈধতা প্রদানের সুযোগ নেই। তাঁরাও কখন দাবী করেন নি তাঁদের জীবন শতভাগ আদর্শ জীবন, তাঁদের অনুসরণ না করলে নরকপ্রাপ্তি হবে।

প্রাচীন ভারতে কীভাবে ও কখন বাল্যবিবাহ শুরু হলো এই প্রসঙ্গে আলোকপাত অতীব প্রয়োজন। আমরা এ বিষয়ে ভারতবর্ষের প্রাচীনকাল হতে আধুনিক সময় পর্যন্ত সম্পূর্ণ ইতিহাস নিয়ে লেখা ১১ খণ্ডের প্রাতঃস্মরণীয় গ্রন্থ "The History and Culture of the Indian People" এর সাহায্য নেবো। বিখ্যাত ইতিহাসবিদ রমেশচন্দ্র মজুমদার এই সিরিজটির সাধারণ সম্পাদক।

তিনি ছাড়াও
V. M. Apte, A. D. Pusalker, B. K. Gosh, H. D. Sankalia, S. Roy, A. K. Majumdar, P. M. Joshi, N. Venkataramanya, S. K. Chatterjee, S. K. Saraswati, J. N. Chaudhuri, G. S. Sardesai, A. L. Srivastava, Abdur Rashid and S. Roy এর মতো বিখ্যাত পণ্ডিতরা এই ১১ খণ্ডের লেখক হিসেবে ইতিহাসের প্যালিওলিথিক যুগ হতে বৈদিক যুগ হয়ে মৌর্য, শক,হুন, সালতানাত, মুঘল, ব্রিটিশ থেকে আধুনিককাল পর্যন্ত সকল ইতিহাস বর্ণনা করেছেন ভারতবর্ষের।

বইটির ১ম খণ্ডে 392 নং পৃষ্ঠায় The Vedic Age বা বৈদিক যুগ সময়কালের বিয়েপ্রথা নিয়ে বলা হয়েছে-

"The frequent mention of unmarried girls like Ghoshā, who grew up in the houses of their parents, the references to the ornaments worn by maidens at festival occasions in order to win lovers to a youth's courtship of the maiden he loves, to the lover's gitts, to their mutual love and to the spell by which a lover hopes to lull the whole household to sleep while he visits his beloved-all this evidence speaks in favour of the custom of girls normally marrying long after they had reached puberty. Some of the passages mentioned above, but not all, may refer to the hetaera class as existing in Vedic society. "
অর্থাৎ ঋগ্বেদ হতে মন্ত্র উল্লেখ করে ইতিহাসবিদরা বলছেন সে সময় বয়ঃসন্ধিকালের অনেক পরে বিয়ে হতো, স্বয়ম্বর সভা হতো, যুবক যুবতীরা একে অপরকে পছন্দ করে বিয়ের করার রীতি ছিল, এমনকি অনেক নারী বিদূষী ছিলেন যাঁরা জ্ঞানসাধনার জন্য অবিবাহিত ই থেকে যেতেন।

আরও বলছে-
"There seems to have been considerable freedom on the part oï young persons concerned in the selection of a wife or husband, as they generally married at a mature age." অর্থাৎ প্রাপ্তবয়স্ক হবার পরেই নিজ নিজ পছন্দের স্বাধীনতা থাকত জীবনসঙ্গী নির্বাচনে।

বইটির ২য় খণ্ডে বলা হয়েছে বৈদিক পরবর্তী স্মৃতিশাস্ত্রীয় যুগ নিয়ে। স্মৃতিশাস্ত্রীয় যুগকে দুইটি ভাগে ভাগ করা হয়েছে। প্রথম ভাগ সম্বন্ধে বলা হয়েছে-

"There are, however, clear indications that during the first half of the period under review, at any rate, there were highly educated women, holding an honourable position in society and household. Two classes of women students are mentioned: Brahmavādini or lifelong students of sacred texts, and Sadyodvāhā who prosecuted their studies till their marriage. Panini refers to women students of Vedic Sākhās. Kātyāyana, in his Värttika, refers to women teachers who were called Upādhyāyā or Upādhyāyī, as distinguished from Upādhyāyānīs, i.e. wives of teachers. The necessity of coining a new term shows that the women teachers were large in number. Patañjali also refers to a special designation for the women scholars who made a special study of Mimāṁsā philosophy.
The Buddhist and Jain texts also refer to women of the Brahmavadini class, i.e. those who remained unmarried to carry on their studies. Most of the Buddhist nuns, whose songs have been preserved in the Therīgāthā, were maidens born in well-to-do families, who renounced the world for the sake of spiritual salvation. "

অর্থাৎ স্মৃতিশাস্ত্রীয় যুগের প্রথম ভাগেও বাল্যবিবাহের প্রচলন তখনও হয়নি। নারীরাও উচ্চ শিক্ষায় শিক্ষিত হতেন, তাঁরা অধ্যাপিকা হতেন যাঁদের বলা হতো উপাধ্যায়ী। ব্রহ্মবাদিনী নারীগণও ছিলেন যাঁরা জ্ঞানসাধনা ও ধর্মীয় শিক্ষা প্রচারের জন্য আজীবন অবিবাহিত ই থাকতেন। যুবতী মেয়েরা উচ্চশিক্ষা সম্পন্ন করে বিয়ে করতেন যাঁদের বলা হতো সদ্যবহু। পাণিনি, কাত্যায়ন এই শ্রেণীর নারীদের কথা উল্লেখ করেছেন। তৎকালীন বৌদ্ধ ও জৈন গ্রন্থেও একই ধরনের প্রমাণ পাওয়া যায়।

কিন্তু স্মৃতিশাস্ত্রীয় যুগের দ্বিতীয়ভাগেই ধীরে ধীরে শুরু হলো সামাজিক অবক্ষয়। বলা হচ্ছে -
There was already a tendency in sutra text to lower the age of marriage for girls. Later Smritis like Yajnavalkya insisted that girl should be given marriage before they reach puberty.
অর্থাৎ স্মৃতিশাস্ত্রীয় যুগের দ্বিতীয়ভাগে সমাজে নারীদের সম্মান কমতে শুরু করে। নারীদের শিক্ষার চেয়ে তাদের দৈহিক অবস্থাকেই তাদের সম্মানের প্রধান প্রতীক হিসেবে নেয়ার ভাবধারা শুরু হয়। এতে করে তাদেরকে যত দ্রুত বিয়ে দিয়ে দেয়া যাবে তত পূণ্য এমন একটি ধারা প্রচলিত হয়।

বৈদিক যুগে নারীদের প্রাপ্তবয়স্ক পূর্ণ শিক্ষিত হবার পর বিয়ে হলেও স্মৃতিশাস্ত্র যুগের দ্বিতীয় ভাগে অর্থাৎ বৌদ্ধ যুগের পর থেকে বিভিন্ন স্মৃতিশাস্ত্রগুলোতে ধীরে ধীরে নারীদের কম বয়সেই বিয়ে দেয়ার পক্ষে বিভিন্ন শ্লোক লেখা হতে থাকে। পরবর্তীকালের স্মৃতিশাস্ত্র যেমন যাজ্ঞবল্ক্য স্মৃতি ইত্যাদিতে শ্লোক রচনা করা হয় যে বয়ঃসন্ধিতে পৌঁছানোর আগেই মেয়েদের বিয়ে দিয়ে দেয়া উচিত। অর্থাৎ খ্রিষ্টপূর্ব ৬ষ্ঠ শতকের পর থেকে ধীরে ধীরে নারীদের বিয়ের বয়স কম দেখানো শ্লোকগুলো রচনা শুরু করা হয়। তবে এ যুগে চূড়ান্ত অধঃপতন হয়নি সমাজে নারীদের, তাই বলা হচ্ছে But the final stage in this downward movement was not reached in during the period under review.

আরও খুব গুরুত্বপূর্ণ একটি কথা উঠে এসেছে লেখকদের আলোচনায় এ অংশে।

"It was rather a transitional period, and we really find two entirely different pictures of women reflected in literary works. In one set of verses in the epics we find women described as fickle, quarrelsome, untruthfulin other words, a veritable pot of poison! She must, therefore, remain (we are told) under control all her life; in girlhood under the guardianship of her father, in youth under the domination of the husband, and in old age in the charge of her sons. In the other set of verses, woman is 'the glory of the home', the symbol of prosperity to the family, (the better) half of the husband, his friend, philosopher and guide, and therefore worthy of all attention and respect. As a mother, she is superior to ten fathers, superior to anything else on earth.
The same sort of contradiction appears in the Smriti works. Manu, for example, declares that gods are pleased with (those households) where women are held in honour, and that a husband should be punished by the king if he cast off the wife, who is not guilty of any crime causing loss of caste. At the same time, he lays down that the husband had absolute rights over the wife to the extent of inflicting corporal punishment and could discard her immediately she says anything disagreeable to him. It is also declared that "by a girl, by a young woman, or even by an aged onc, nothing must be done independently, even in her own house."

অর্থাৎ এই যুগের প্রথম দিকে নারীদের সম্মান অনেকটা বৈদিক যুগের মতোই থাকলেও পরেরদিকে যে তার অবনমন ঘটে এই বিষয়টি স্মৃতিশাস্ত্র ঘাঁটলেই দেখা যায়। যেমন আমরা মনুস্মৃতিতেই দেখি কিছু শ্লোকে নারীদের অত্যন্ত উচ্চ মর্যাদা দেয়া হয়েছে যেগুলো হলো আসল মনুসংহিতার মূল শ্লোক, আবার কিছু শ্লোকে নারীদের অত্যন্ত অবমাননা করা হয়েছে যেগুলো এই যুগের দ্বিতীয়ভাগে রচিত নকল শ্লোক। আজ আমরা জানি মনুস্মৃতিতে থাকা ২৬৮৫ টি শ্লোকের ১৪০০ এর অধিক শ্লোক ই নকল বা প্রক্ষিপ্ত শ্লোক। মেধাতিথির ন্যায় প্রাচীন পৌরাণিক আচার্যরাও মনুসংহিতায় এই নকল শ্লোক সংযুক্ত হবার বিষয়টি স্বীকার করে গেছেন। এভাবেই এই যুগের দ্বিতীয়ভাগে নারীদের সামাজিক অবস্থান অবনমিত হতে শুরু করে এবং তা জোরদার করার জন্য সমাজপতিরা স্মৃতিশাস্ত্রে নকল শ্লোক রচনা করে নারীর বিয়ের বয়স কম দেখাতে শুরু করেন কেননা সমাজের সাধারণ মানুষকে ধর্মগ্রন্থের শ্লোকরূপে কম বয়সে বিয়ের নির্দেশ দেখালে তারা সহজেই তা মেনে নেবে।

এরপর বইটির ৩য় খণ্ডে আলোচিত হয়েছে Classical Age নিয়ে(খ্রিষ্টপূর্ব ৩য় শতক থেকে খ্রিষ্টীয় ৬ষ্ঠ শতক), যখন কিনা মহাভারত রামায়ণের পাণ্ডুলিপি পূর্ণতাপ্রাপ্ত হতে শুরু করে পরবর্তীকালের কবিদের হাত ধরে, ব্যাসদেব ও বাল্মীকিমুণির রচিত প্রাচীন শ্লোকের সাথে কয়েকগুণ নতুন শ্লোক রচিত হয় নব্য কবিদের হাতে, বৈষ্ণব সাহিত্যের রচনাও শুরু হয় এ সময়ে, অশোকলিপিও এই সময়কার ই ঘটনা। মহাভারতের কিছু প্রামাণ্য শ্লোকের সাথে বিপুল পরিমাণে নতুন রচনা যুক্ত হয়ে রচিত হয় হরিবংশ। আর এই যুগেই প্রাচীন পুরাণ সমূহের রচনাও শুরু হয় এবং চূড়ান্ত অধঃপতন ঘটে নারীদের অবস্থানের। এই যুগেই পুরাণে নারীদের ৮ বছর বয়সেই বিয়ে দিয়ে দেয়া, মাতা সীতার বিয়ের বয়সকে কমিয়ে ৬ বছর দেখানো, মাতা রুক্মিণীর বিয়ের বয়স কমিয়ে স্কন্দ,পদ্ম সহ বিভিন্ন পুরাণে ৮ বছর দেখানোর জন্য নকল শ্লোকগুলো রচিত হওয়া শুরু করে। ইতিহাসবিদগণ এই অংশে বলছেন-

“The rules relating to marriage, formulated in the older Smsitis, are not materially altered during this period, but there is a growing tendency to lower the marriageable age of girls. Some texts make it compulsory for the guardian to marry the girl before puberty. According to Vishnu Purāna the age of the bridegroom should be three times that of the bride.”

অর্থাৎ এই ক্লাসিকাল তথা বৈষ্ণব সাহিত্যের পৌরাণিক যুগে বিয়ের পদ্ধতি আগের স্মৃতিযুগের মতোই থাকলেও মেয়েদের বিয়ের বয়স আরও কমতে শুরু করে। সেগুলোর পক্ষে পুরাণসমূহে প্রচুর শ্লোক রচিত হতে থাকে। বিষ্ণুপুরাণে শ্লোক রচনা করা হয় যে বরের বয়স কনের অন্তত ৩ গুণ হওয়া উচিত। আর এই শ্লোকগুলোর রেফারেন্স ই সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যমে এখন বিচরণ করছে সনাতন ধর্মে বাল্যবিবাহের সমর্থন আছে দেখানোর জন্য যদিও সনাতন ধর্মের প্রধান ধর্মগ্রন্থ পবিত্র বেদ স্পষ্টই বাল্যবিবাহকে নিষিদ্ধ করেছে এবং শিক্ষাজীবন সম্পূর্ণ করে যুবাবস্থায় নারীপুরুষকে বিয়ে করতে নির্দেশ দিয়েছে। এভাবেই খ্রিষ্টপূর্ব ৩য় শতক থেকে খ্রিষ্টীয় ৬ষ্ঠ শতকের মধ্যে সনাতন সমাজে পৌরাণিক ভাবধারা একদম জেঁকে বসে, নারীদের অবস্থার চূড়ান্ত অবনমন হয়, বর্ণাশ্রম ধর্ম সম্পূর্ণরূপে বর্ণপ্রথায় রূপান্তরিত হয়। লেখকদের লেখাতেও উঠে এসেছে ৭ম শতকের সময় হতে দেখা যায় এই পৌরাণিক প্রথাই সমাজে প্রচলিত হয়ে যায় যে মেয়েদের ৬ বা ৮ বছর বয়সেই বিয়ে দিয়ে দিতে হবে-

“As regards the marriageable age of girls, Medhātithi agrees with the views of the authorities of the preceding age. Girls, says he, should be given away in marriage when

they are eight or six years old and called nagnikā. Again he says 106 that the right time for giving away a girl in marriage is between her eighth year and her attaining puberty."

আর এজন্যেই আমরা দেখতে পাই পুরাণসমূহে বাল্যবিবাহ নিয়ে যত নকল শ্লোক রয়েছে সবগুলোতেই কনের বয়স হয় ৬ অথবা ৮ দেয়া হয়েছে। আর বর্তমান প্রজন্ম ইতিহাস না জেনেই সেগুলোকে সত্য ধরে মাতা সীতার বিয়ের বয়স ৬ আর মাতা রুক্মিণীর বিয়ের বয়স ৮ প্রচার করছে যাতে যোগ দিয়েছে অনেক নামধারী শিক্ষক, ধর্মীয় নেতা, ফেসবুক সেলিব্রিটিরা যাদের অধ্যয়নের সময় সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যমে বিচরণের কারণে এতই হ্রাস পেয়েছে যে তারা আর গবেষণা বা পড়াশোনার প্রয়োজন বোধ করেন না।

আর পুরাণের এতগুলো নকল শ্লোকের মাঝেই ক্লাসিকাল যুগের প্রথম দিকে রচিত হরিবংশের একটি শ্লোকে বিয়ের সময় শ্রীকৃষ্ণ পত্নী মাতা রুক্মিণীর আসল বয়সের ইঙ্গিত পাওয়া যায়।

হরিবংশ বিষ্ণুপর্ব ৫৯।৩৭-৩৮ এ দেখা যায় শ্রীকৃষ্ণ যেদিন রুক্মিণীকে দেখেন-

কৃষ্ণেন মনসা দৃষ্টাম দূর্নির্লক্ষ্যম্ সুরৈরপি।।
শ্যামাবদাতা সা হ্যাসীৎ পৃথুচার্বাযতেক্ষণা

অর্থাৎ যাঁর দর্শন পাওয়া ছিল অতীব কঠিন তাঁকে শ্রীকৃষ্ণ নিজের অন্তর দিয়ে দর্শন করলেন যিনি ছিলেন গৌরবর্ণ ১৬ বছর বয়স্কা আয়তচক্ষু।

অর্থাৎ বিবাহের সময় রুক্মিণীর বয়স ছিলো কমপক্ষে ১৬ বছর । আর আগেই দেখিয়েছি ক্লাসিকাল যুগের সাহিত্যে মেয়েদের বিয়ের বয়স কমানো হচ্ছিল, আর সেই কমিয়ে দেখানো পর্যায়ের শ্লোকে মাতা রুক্মিণীর বয়স দেখানো হয়েছে ১৬ বছর। অর্থাৎ এই ১৬ হলো বিয়ের সময় তাঁর ন্যূনতম বয়স, সম্ভাবনা এটাই অধিক যে মূলত তাঁর বয়স আরও বেশীই ছিল। আর বলাই বাহুল্য শ্রীকৃষ্ণকর বয়স তখন আরও বেশী ছিল, তিনি তখন ছিলেন দ্বারকার De Facto রাজা।

এটিই হলো প্রাচীন ভারতে বাল্যবিবাহের ইতিহাস। বৈদিক যুগে বেদের আদেশ মেনে চলা সমাজে বাল্যবিবাহ হতো না, নারীরাও পুরুষের সমান মর্যাদা পেতো, তাঁরা অধ্যাপিকা, ব্রহ্মবাদিনী হতেন, যোদ্ধা হতেন, রাজা হতেন। পরবর্তীতে স্মৃতিশাস্ত্রীয় যুগের প্রথম পর্যায়ে নারীদের অবস্থান প্রায় বৈদিক যুগের মতো থাকলেও দ্বিতীয় পর্যায়ে অর্থাৎ খ্রিষ্টীয় ৬ষ্ঠ শতকের পর বৈদিক শিক্ষার অভাবে নারীদের সমাজে অবস্থান কমতে থাকে, তাদের বিয়ের বয়স কমতে থাকে এবং তাকে বৈধতা প্রদানের জন্য বিয়ের বয়স কম হওয়া উচিত এমন শ্লোক রচিত হতে থাকে যা আমরা মনুসংহিতায় বর্তমানে দেখতে পাই।
মনুসংহিতায় আমরা দেখি প্রথম দিকের শ্লোকসমূহে নারী অধিকারের পক্ষে কথা বললেও পরবর্তীতে যুক্ত হওয়া নকল শ্লোকগুলোতে নারী অধিকারের বিপক্ষে অমানবিক সব বক্তব্য। এরপর ক্লাসিকাল যুগে (খ্রিষ্টীয় ৩য় শতক বা তার পর) পুরাণসহ বৈষ্ণবীয় সাহিত্য রচিত হতে থাকে যখন সমাজে বেদজ্ঞানের অভাবে অবক্ষয় চরমে। সে সময় সব পুরাণ ও অন্যান্য সাহিত্যে বর্ণপ্রথা ও বাল্যবিবাহকে বৈধতা দেয়ার জন্য বেদবিরুদ্ধ সকল শ্লোক রচনা করা হয়। নারীদের ৬ বা ৮ বছরে বিয়ে না দিলে তা পিতার জন্য মহা অমঙ্গল বলে ঘোষণা করা হয় বিষ্ণুপুরাণ সহ অন্যান্য পুরাণে। আর ঐতিহাসিক সব চরিত্র যেমন মাতা সীতা বা মাতা রুক্মিণী সহ সকলের বিয়ের বয়স ই গণহারে ৬ বা ৮ দেখিয়ে নতুন শ্লোক রচনা করা হয় যেগুলো এখন সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যমে চর্চার বিষয় হয়ে দাঁড়িয়েছে। কিন্তু সতর্কতার সাথে পর্যবেক্ষণে আমরা গতকাল দেখেছি মাতা সীতার বিয়ের সময় বয়স কমপক্ষে ১৭ এবং মাতা রুক্মিণীর

কমপক্ষে ১৬ ছিল। শেষ করব বিয়ের বয়স প্রসঙ্গে সনাতন ধর্মের সর্বোচ্চ আইন পবিত্র বেদে দেয়া ঈশ্বরের আদেশ দিয়ে-

য়ুবা সুবাসাঃ পরিবীত আগাৎ স উ শ্রেয়ান ভবতি জায়মানঃ ।
তং ধীরাসঃ কবয় উন্নয়ন্তি স্বাধ্যো ৩ মনসা দেবয়ন্তঃ ॥
(ঋগ্বেদ ৩/ ৮/ ৪)

অনুবাদঃ যে পুরুষ সর্বতাভোবে যজ্ঞাপেবীত ধারণ ও ব্রহ্মচর্য সেবন দ্বারা বিদ্বান্ এবং সু শিক্ষিত হইয়া , সুন্দর বস্ত্র পরিধান পূর্বক , ব্রহ্মচর্য্যযুক্ত পূর্ণ যৌবন প্রাপ্ত হইয়া , বিদ্যাগ্রহণ করিয়া গৃহাশ্রমে প্রবেশ করেন , তিনিই দ্বিতীয় বিদ্যাজন্মে প্রসিদ্ধি লাভ করিয়া অতিশয় শাভোযুক্ত ও মঙ্গলকারী হন । উত্তম ধ্যানযুক্ত বিজ্ঞান দ্বারা বিদ্বানেরা সেই পুরুষকে উন্নতিশীল করিয়া প্রতিষ্ঠিত করেন । আর যে স্ত্রী পুরুষ , ব্রহ্মচর্য্য ধারণ , বিদ্যা এবং সুশিক্ষা গ্রহণ না করিয়া বাল্যাবস্থায় বিবাহ করে তাহারা নষ্ট - ভ্রষ্ট হইয়া বিদ্বান্ ব্যাক্তিদের মধ্যে সম্মান লাভ করেনা ॥

Lord Krishna: An enlightening Personality

Dr. Shree Satyapal Singh
Former HRD minister and MP-Bagpat

I am experiencing mixed feelings of ecstasy and awareness of my own limitations while writing this article on the most illustrious and enlightened man of the era – the Lord Krishna. In the long history of almost last 5000 years there has been no equivalent to such a great Householder soul like Shrikrishna in India or even elsewhere on this Earth. The myth goes that before the birth of Shrikrishna, his parents (Devaki and Vasudeva) were kept behind the bars at Mathura by King Kansa. But the moment Shrikrishna was born, the doors of the jail suddenly (automatically) opened and was safely shifted to Gokul. It is entirely needless to probe into this myth for its veracity. But one can easily imagine that when the jail shackles were all of a sudden got cut asundered at the time of the birth of this superhuman, how many miserables must have been rescued by him throughout the lifespan of this divine towering figure ! It is so stunning that this child born in the walls of the prison grows into a savior later in his life and relieves the entire world from the jail of engulfing unrighteousness and sins. The baby deprived even of the privileges of his mother' s milk right from the moment he was born, anchored the salvation of innumerable mothers.

Historicity –

Historically Shrikrishna belongs to the end of Dvapara Yuga. The position he occupies and the role he plays in the great war of Mahabharata, is extremely important and significant. The Mahabharata war itself gave birth to Gita, the divine celestial speech (Devavani). The Indologists in the light of available historical records and literary documents, astronomical references (the positions of constellations) have concluded that the war of Mahabharata broke out on 12th November 3143 B.C, which means almost 5152 years back. Now any historian or any research worker should have no doubt or prejudice of any order in this regard. Before the British Rule in India, in the pre-historic period, time was measured astronomically in terms of Kalpas and Yugas. (aeonic temporal cycles) The beginning of the new era was called Yugabda. Astronomically speaking the present Kaliyuga started 5109 years ago. Shrikrishna lived till the initial few years of Kaliyuga.

Childhood

The Childhood of Shrikrishna was spent in Gokul, Vrundavan area. The foster parents Nanda -Yashoda nurtured him with great zeal, love and care. It is said that Nanda had the herds of 10000 cows in his

possession. Even if we consider it to consist only of 1000 cows for a time being, why should then their beloved son go to others' houses and that too for stealing and enjoying the butter stolen ? Nanda and Yashoda were so pure-hearted couple that they would have never hesitated and would have easily agreed to give away their baby-girl to replace and save the sibling of their friend Vasudeva, so how was it possible that they would allow any bad habits like that of stealing and telling lies to get inculcated in the exceptional child of their bosom friend? This is nothing but an utopia or wild imagination of poets like Surdasa and others, – and factually there is no substance in all such stories.

Granted that there could be some childhood anecdotes associated with Shrikrishna, natural to the age under the caption Balalila (Childhood amusements). But these poets and followers went to the extreme by converting them into Rasalila(amorous youthful sports.) – an act of spiritual distortions of Krishnalila.

Radha and Gopis

Some poets from rhetoric school and bhakticult accepted Lord Shrikrishna as a God, worshiped him, adorned him as blind devotees and followers on one hand, and on the other the Western scholars and their self esteemed, the so called Indian scholars, following their footsteps merely depicted him in various ways with low level intentions and sensual impulses. Shrikrishna to them was one who played in the group of Gopis under the sacred name Rasalila, as one stealing the garments of the women, the one engaged and indulging in youthful activities with the damsel by name Radha, making uncourteous hideous gestures with dwarfed maiden Kubja.

The rhetoric school poets wanted to hide their sensual impulses and writings from the indignation of common people in the society. The blind and self titled devotees wanted to escape themselves from the scornful attitude of common man towards them, their selfish and voluptuous behavior or actions and their luxurious and lavish life style made under the pretext of divine justification and conformation. The Western scholars and others belonging to different religions than that of Hindus, and not to speak of other pseudo scholars wanted to devaluate and bring down the supreme Indian culture and Indian religion – a sort of burning example for all. Thus they mutilated the very noble character of Lord Krishna into an ignoble and scandalous one.

In the whole of Mahabharata, there is no mention even of the name Radha. We first get glimpses of her, in Gita Govinda of Jayadeva, in the Bhagvat of Bopadeva, his real brother and also in other literary description in the works like Brahma Vaivarta Purana, etc. One comes across in Brahma Vaivarta Purana the illicit love affairs of Radha with Krishna. In the same Purana also many contrary types of relations are alluded regarding the relations between them. Somewhere she is depicted as the daughter of Shrikrishna. Some where she is related as Shrikrishna' s aunt (wife of Rayana, brother of Yashoda), sometimes as his daughter-in-law and sometimes as the sister of Shrikrishna. (If some one has any doubts, or wants to know any further details, then all references can be made available).

Noble Character

Bankimchandra Chattopadyaya, the author of "Anand math" who carried out research on Mahabharata continuously for about 36 years and also composed thereafter the biography of Shrikrishna, states that according to Mahabharata Shrikrish-

na had only one wife namely Rukhmini – neither two nor four and of course not at all 16000. According to Mahabharata immediately after getting married both Rukhmini and Shrikrishna went to Badrikashrama and led a pious life there for 12 years. They used to sleep on ground, ate only roots, tubers and fruits and observed strict celibacy. Thereafter Rukhmini gave birth to the first child named Pradhumna. It is sheerly disgusting to stigmatize this noble character shown indulging in love-affairs with and in romance with Radha and Gopis.

Bankimchandraji has stated " Bhagwan Shrikrishna in all respect was free from all blemishes and was of very pure conduct. Such an ideal character endowed with all virtues, free from all sins never did exist and would hardly exist at anytime, anywhere, neither in this country nor any where in the world. He was a multi-faceted, accomplished and pure soul. (Krishnacharita)." Swami Dayananda states that Shrikrishna was the best of all the characters in the epic Mahabharata. His qualities, deeds, nature and character all are similar to those of accomplished persons(apta or siddha), and were simply magnanimous. He never committed any sin or any impious act right from his birth till his death. Whatever aspersions, thrown on Shrikrishna are all just because of Bhagvata only (Satyarthprakash).

There is a clear and categorical statement in Maharabhata (Sabha-parva) that in Indraprastha at the time of Rajsuya yagna, performed by Yudhisthira amongst all the invitees like hundreds of Kings, Monarchs, Rishi – Munis and scholars Shrikrishna by all means was considered and reckoned as the wisest, strongest, most valorous and the most distinguished figure of the world and was honoured by Agrapuja (foremost felicitation) and was offered in Arghya(respect) . But behold his unassuming gentle nature! At the time of yajna, he modestly offered himself to welcome the Rishi – Munis and scholars by washing their holy feet – the highest token of selflessness. The real wisdom can be so simple and so modest. He was just the role – model.

Unfaltering Faith

When Krishna completed his studies in the Sandeepanee Ashrama at Ujjayani Guru Angiras Ghora gave him a final instruction: "O Krishna! when you will reach the last moment of your life, when the death will be knocking at your door, recite the following sentences" 1) Tvam akshitamasi – Hey Almighty thou art eternal, non decayable 2) Tvam achyutamasi -Thou art infallible /non-deviating 3) Tvam prana sanshitamasi – Thou art the minutest and life infusing, similar to the prana. And the author of Upanishads says that Krishna was fully contented and appeased on getting this message. There is then no need of any instruction or advice, as Krishna was knowing that one can remember at the last moment only that which one follows or observes throughout his life.

And this is exactly why Krishna used to get up early at 3 am – the Brahma-muhurta (auspicious time) and used to repeat the Gayatri mantra thousand times. The Author of Mahabharata (the Vyasa Muni) writes that when Krishna went to Hastinapura as a messenger of peace, at the sunset, he would stop his chariot, take a pause, release the horses from chariot and sit for meditation on the way. During the war, when Abhimanyu was killed, Arjuna was in deep sorrow in the evening. Krishna was also very much grieved as Abhimanyu, the only son of his sister Subhadra and his bosom friend Arjuna was killed. But behold the stable – minded

(sthitaprajna i.e. unification of grasping sustaining and recollecting faculties of knowledge – dhi, dhirti & smriti) Krishna. He instructs Arjuna to join him in evening prayers after which they could come back to this issue as well as the plan for next day' s war.

In Gita, for great happiness and serenity,(Prasannatva) Krishna again and again invites you to seek shelter and protection of that which is perfect and unchangeable Almighty, free from the shackles of birth and death, with His abode in the heart of every being, who controls everybody like the parts of a machine and bestows us the fruits and rewards of our deeds. He advises us to pray, repeat and recite Omkar for worshipping that Almighty who is praised by all Vedashastras and whom all the Rishimuni' s try to attain by penance and austerity.

And even when death (Lord Yama) in the form of an arrow of a hunter (Vyadha), approached and knocked his door, Shrikrishna was engrossed in meditation of the Almighty. Wasn' t it totally and completely following the last instructions given to him at the end of his studies by his Guru.

Opposing injustice

Throughout his life, Bhagvan Shrikrishna kept on awakening and evoking everybody against injustice. His birth itself is known for breaking off the shackles of jail. Shrikrishna who was born in the filth of injustice kept on fighting for it throughout his life. Even his childhood was not so easy and comfortable like other children. On the contrary he grew up bearing all atrocities of Kansa. Right in the adolescent stage Shrikrishna took some strategic steps like organizing people from Gokul, Vrindavana and Mathura and gave them training in arms. He did all this not only to liberate his parents from jail but also for opposing and fighting the injustice and to end up the pitiable conditions and cries of people. Even after killing Kansa, as he was fighting with the other cruel kings like Jarasandha and that was the strategic action and mission of his life. Doing all this, though he had to flee from the land of Mathura and Vrindavana, had to go very far and had to establish and settle down in Dvaraka, but he never and no where compromised with injustice.

The entire great war of Mahabharata, the whole sermon of the Gita, is nothing but the veritable invitation to get armed to fight against injustice. If we win while fighting the injustice then only we can enjoy the riches of this planet Earth and if we meet death on the battle field then we will win the Heaven this is what Shrikrishna says.

"hato va prapyasi svargam jitva va bhoksyase mahim"

When and while he was being prevented by the situation from participating in the war with his arms and weapons he even accepted to become the charioteer of brave archer (Dhanurdhari) Arjuna only for ending the injustice. He never wanted to get away from the war against injustice. To fight against the injustice and profanity and finish it from this world was the mission and goal of his life. All advices and sermons he laid down in Gita, every word that he uttered, whether he was talking of Yoga or of stable genius (sthitaprajna), wisdom, always gave inspiration to fight and propelled them against the injustice. The perishability of the body, immortality of the soul, concentration of the mind, and undisturbed equanimity, calm and peaceful disposition of mind – all was to be described and explained in detail by Krishna so that Arjun, caught in the bewitching trap and completely at his wit' s end should pick up his arms and pounce

upon injustice, otherwise all these utterances were unnecessary right at the beginning of the war of Mahabharata, certainly not so important as to attract the attention of an magnanimous personality like Krishna.

Shrikrishna did not become Lord Krishna just because he was the son of Vasudeva, Devaki or not even because he was brought up in the riches of Yashoda mata and father Nanda. He was laid to the position of the Lord because directly or indirectly his Sudarshana-chakra,(Divine beautiful disc or wheel) his special weapon, kept on defeating injustice. Years ago a statue of Shrikrishna in stone was found during the excavation at Gorakhpur (Uttar Pradesh). The English version of Sanskrit write up found on it was as below.

When there are clouds of hypocrisy and when the sins turn into the storm, then – my melodious flute takes a form of small spear.

The whole life of Shrikrishna was like a roaring sound of a conch. The vow he took for wiping out the profanity and injustice from this Earth and the establishment of religion and justice instead.

There is always something very special about every eminent personality of the society and this world. Some of them were the founders of new religion or religion reformists, some were profound scholars or scientists laying bare the secrets of nature, some dispellers of ignorance, some were worshippers of gallantry, or visionary of independence, freedom or even liberty, some unattached Yogi or some discriminative statesmen, some destroyer of social injustice and some ardent proponent of justice. But in the history of the whole world, Shrikrishna is the only greatest personality whose character encompasses together all these diverse ideals. Dear readers, devotees of Krishna, let us take a pledge today, let us make a resolution that we will not allow even advertently any blemish to defame the noble life of that spotless, innocent, virtuous and realized soul. Let us follow the footsteps of the ideals of great people. Following are the words of Krishna

yad yad acarati shresthasthat devetaro janah

sa yat pramam kurute lokas tadanuvartate

This is thus the preaching of life and the simple solution of finding happiness, peace and prosperity in life.

আমার আরাধ্য ভগবান শ্রীকৃষ্ণ

শ্রী সৈকত দাস

"য়তঃ সত্য য়তঃ ধর্ম্মো য়তো হীরার্জ্জবং য়তঃ।
ততো ভবতি গোবিন্দ য়ত কৃষ্ণস্ততো জয়ঃ।।"

[মহাভারত; উদ্যোগ পর্ব; অধ্যায়: ৬৬/১৯]

অর্থ: যেখানে সত্য, যেখানে ধর্ম, যেখানে লজ্জা ও যেখানে সরলতা থাকে সেইখানেই কৃষ্ণ থাকেন। আর যেখানে কৃষ্ণ থাকেন সেখানেই জয় সর্বদা হয়ে থাকে।

এ যুগের সর্বশ্রেষ্ঠ বেদজ্ঞমহর্ষি স্বামী দয়ানন্দ সরস্বতীর দৃষ্টিতে ভগবান শ্রীকৃষ্ণ–

"শ্রীকৃষ্ণের ইতিহাস মহাভারতে অতি উত্তম। ওনার গুণ, কর্ম, স্বভাব এবং চরিত্র আপ্ত পুরুষের সদৃশ। সেখানে শ্রীকৃষ্ণ কোন অধর্মের আচরণ এবং জন্ম থেকে মৃত্যু পর্যন্ত কোন খারাপ কাজ করেছেন, এমন কিছু লেখা নেই।"

সত্যার্থ প্রকাশ, একাদশ (১১) সমুল্লাস

শ্রী বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়ের দৃষ্টিতে ভগবান শ্রীকৃষ্ণ–

"কিন্তু এরূপ ধর্মপরিবর্ধক আদর্শ যেরূপ হিন্দুশাস্ত্রে আছে, এমন আর পৃথিবীর কোন ধর্মপুস্তকে নাই—কোন জাতির মধ্যে প্রসিদ্ধ নাই। জনকাদি রাজর্ষি, নারদাদি দেবর্ষি, বশিষ্ঠাদি ব্রহ্মর্ষি, সকলেই অনুশীলনের চরমাদর্শ। তাহার উপর শ্রীরামচন্দ্র, যুধিষ্ঠির, "অর্জুন, লক্ষ্মণ, দেবব্রত, ভীষ্ম প্রভৃতি ক্ষত্রিয়গণ আরও সম্পূর্ণতা" প্রাপ্ত আদর্শ।

খ্রীষ্ট ও শাক্যসিংহ কেবল উদাসীন, কৌপীনধারী নির্মল ধর্মবেত্তা। কিন্তু ইঁহারা তা নয়। ইঁহারা সর্বগুণবিশিষ্ট ইঁহাদিগেতেই সর্ববৃত্তি, সর্বাঙ্গসম্পন্ন স্ফূর্তি পাইয়াছে। ইঁহারা সিংহাসনে বসিয়াও উদাসীন; কামুকহস্তেও ধর্মবেত্তা; রাজা হইয়াও পণ্ডিত; শক্তিমান্ হইয়াও সর্বজনে প্রেমময়। কিন্তু এই সকল আদর্শের উপর হিন্দুর আর এক আদর্শ আছে, যাঁহার কাছে আর সকল আদর্শ খাটো হইয়া যায়— যুধিষ্ঠির যাঁহার কাছে ধর্ম শিক্ষা করেন, স্বয়ং অর্জুন যাঁহার শিষ্য, রাম ও লক্ষ্মণ যাঁহার অংশমাত্র, যাঁহার তুল্য মহামহিমাময় চরিত্র কখন মনুষ্যভাষায় কীর্তিত

হয় নাই।”

এই তত্ত্বটা প্রমাণের দ্বারা প্রতিপন্ন করিবার জন্যেও শ্রীকৃষ্ণচরিত্রের ব্যাখ্যানে প্রবৃত্ত হইয়াছি।

[কৃষ্ণচরিত্র]

ইতিহাসবেত্তা শ্রীদুর্গাদাস লাহিড়ীর দৃষ্টিতে ভগবান শ্রীকৃষ্ণ—

“পুঙ্খানুপুঙ্খ কত বলিব? ভীষ্মের ন্যায় মহান চরিত্র, ধৃতরাষ্ট্রের ন্যায় প্রজ্ঞা-বুদ্ধি,– কোন দেশের কোন ইতিহাসে দেখিতে পাই? দ্রোণ, ভীম, অর্জুন, যুধিষ্ঠির, দুর্য্যোধন, শকুনি, অশ্বত্থামা, এক এক চরিত্রে এক এক ভাবের পূর্ণ বিকাশ। আবার, সকল শিক্ষার পূর্ণ বিকাশ মহাভারতের শ্রীকৃষ্ণ চরিত্রে। মহাভারতের শ্রীকৃষ্ণ দেবতা রূপে চিত্রিত নহেন; তিনি আদর্শ মনুষ্যরূপে প্রতিষ্ঠিত। মনুষ্য কতদূর উন্নত হইতে পারে, বল-বুদ্ধি জ্ঞান সর্ববিষয়ে কিরূপ উৎকর্ষ লাভ করিতে পারে, মহাভারতের শ্রীকৃষ্ণ চরিত্রে তাহাই প্রদর্শিত হইয়াছে। শ্রীকৃষ্ণে যেন সকল বৃত্তির স্ফুর্ত্তি! শ্রীকৃষ্ণ পূর্ণ মনুষ্য। পূর্ণত্ব লাভ করিতে হইলে, মনুষ্যের কোন্ আদর্শ অনুসরণ করা কর্তব্য, মহাকবি বেদব্যাস, শ্রীকৃষ্ণ চরিত্রে তাহা পরিস্ফুট করিয়াছেন। মহাভারতের শ্রীকৃষ্ণ জ্ঞানের অবতার; মহাভারতে তাঁহার প্রবীণত্বের পরিচয়।”

“পৃথিবীর উপর দিয়া বিবর্তনের কি প্রবল প্রবাহই চলিয়াছে! কতই ভাঙ্গিতেছে— কতই- গড়িতেছে! কত জাতির অভ্যুত্থান ও অধঃপতন ঘটিল,—কত নব নব সাম্রাজ্য, কত নব নব ধর্ম্ম-সম্প্রদায়, কত ভাবে কালের ক্রোড়ে ক্রীড়া করিয়া গেল! কিন্তু সেই বিশ্ব - বিপ্লবকারী বিবর্তন - প্রবাহের মধ্যেও ভারতবর্ষ আপনার স্বাতন্ত্র্য রক্ষা করিতে সমর্থ হইল। সে দেখিল— তাহার চক্ষের উপর কত জাতি কত ভাবে ভাসিয়া গেল! সে দেখিল — কালের তাণ্ডব লীলা কত সম্প্রদায়কে কেমন ভাবে ভাঙ্কিয়া গড়িয়া লইল! কিন্তু, কি আশ্চর্য্য, তাহার উপর বিবর্তনের সে প্রভাব কার্যকরী হইল না! কি জানি , কোন মহীয়সী মহিমা সে বিপ্লবে তাহাকে রক্ষা করিল! জল - বুদবুদের ন্যায় কত জাতি উঠিল ও মিশিয়া গেল; কিন্তু ভারতবর্ষের হিন্দু - জাতি অক্ষুণ্ণ রহিল! কত সমাজ কত ধর্ম্ম - সম্প্রদায় চাকচিক্যই দেখাইবার সুযোগ পাইল, কিন্তু জলদ - কোলে ইন্দ্রধনুর ন্যায় তাহাদের অস্তিত্ব কোথায় লুকাইয়া গেল! অথচ, সূর্য্যগম প্রভাববান হইয়া রহিল- ভারতবর্ষের সনাতন ধর্ম্ম।

সেই সনাতন ধর্ম্মের অনুসারী এই হিন্দু-জাতি। যখন দেখিতে পাই, বিবর্তনই বিশ্বজনীন নিয়ম; তখন সেই নিয়মের ব্যতিক্রমকারি এ অভাবনীয় অচিন্তা-পূর্ব্ব ঘটনার কারণ কি? এর কারণ — ভগবান শ্রীকৃষ্ণ। শুভক্ষণে ভারতভূমিতে কৃষ্ণচন্দ্রের আবির্ভাব হইয়াছিল; তাই সেই বিবর্তনের বিষম সঙ্কটের দিনেও হিন্দুজাতি রক্ষা পাইয়া গেল! শ্রীকৃষ্ণ যদি ভারতবর্ষে আবির্ভূত না হইতেন, তাহা হইলে বোধ হয়, ‘ভারতবর্ষ’ নাম পর্যন্ত লোপ পাইত; তাহা হইলে বোধ হয়, ‘হিন্দুস্তান’ সংজ্ঞা ইতিহাসের অঙ্গ হইতে মুছিয়া যাইত; তাহা হইলে বোধ হয়, পৃথিবীর অন্যান্য লোপ-প্রাপ্ত প্রাচীন জাতি-সমূহের নামের সঙ্গে, ‘হিন্দুর’ নামটি মাত্র ক্বচিৎ গ্রথিত থাকিত! কোথায় সে প্রাচীন মিশর-কাল-প্রভাবে ভাসিতে ভাসিতে গিয়া কাহার অঙ্গে অঙ্গ মিশাইয়া দিল! সে জাতির কীর্তি-গুপ্ত পিরামিড-স্তূপ! - তুমি

কি সাক্ষ্য দিতে পার তোমার সেই লোকপ্রসিদ্ধ নির্ম্মাতৃগণ এখন কি ভাবে কোথায় অবস্থান করিতেছেন! প্রাচীন রোম! - প্রাচীন গ্রীস! তোমরা তো জগতের বক্ষে সে দিন মাত্র ক্রীড়াশীল ছিলে! তোমরাই বা এখন কোথায় কি ভাবে অবস্থিতি করিতেছ? কাল প্রবাহে বিচরণশীল আসিরীয়া, বাবিলন, ফিনিসীয়া-বুদবুদের প্রায় কোথায় মিশিয়া গেলে? প্রাচীন কাহারও কোনও পরিচয়-চিহ্ন— ক্রম-পর্যায়— কোথাও অনুসন্ধান করিয়া মিলিবে না। কিন্তু সে পরিচয় অক্ষুণ্ণ আছে— ভারতবর্ষে। ভারতবর্ষ আজিও তারস্বরে ঘোষণা করিতে সমর্থ—তাহার পিতৃ-পরিচয়ের এখনও ক্রমভঙ্গ হয় নাই। সেই হিন্দু, আজিও আপনাকে হিন্দু বলিয়া পরিচয় দিতে স্পর্ধা অনুভব করিতে পারেন, সেই ব্রাহ্মণ – আজিও আপনাকে বরেণ্য আসনে অধিষ্ঠিত রাখিতে সমর্থ আছেন। এ ক্রম-পর্যায় রক্ষার মুলাধার—ভগবান শ্রীকৃষ্ণ। শ্রীকৃষ্ণ ভারতের ইতিহাসে তাই প্রাণস্থানীয় । “

[পৃথিবীর ইতিহাস]

ছিলেন পরম নীতিজ্ঞ

ভগবান শ্রীকৃষ্ণ ছিলেন পরম নীতিজ্ঞ। কেননা রাষ্ট্রনীতি, সমাজনীতি, ধর্মনীতি সকল নীতি শিক্ষা দানেই তাঁর মহিমা বিকশিত।

কৌটিল্য কূটনীতিতে শুক্রাচার্যকে শ্রেষ্ঠ বলে অভিহিত করেছেন। কিন্তু শুক্রাচার্য তাঁর মৎপ্রণীত ‘নীতিসার’ গ্রন্থে বলেছেন “ভগবান কৃষ্ণের ন্যায় কোনো কূটনীতিজ্ঞ এই ধরণিতে নেই”।

“ন কূটনীতিরভবৎ শ্রীকৃষ্ণ সদৃশোনৃপঃ”

[শুক্রনীতি. ৪/১২/৯৭]

মহাত্মা, মহাপ্রাজ্ঞ বিদুরের দৃষ্টিতে ভগবান শ্রীকৃষ্ণ-

অর্থেন তু মহাবাহু বার্ষ্ণেয়ং ত্বং জিহীর্ষসি।
অনেন চাপ্যুপায়েন পাণ্ডবেভ্যো বিভেৎস্যসি।।
ন চ বিত্তেস শক্যোহসৌ নোদ্যমেন ন গর্হয়া।
অন্যো ধনংজয়াৎ কর্তুমেতৎ তত্ত্বং ব্রবীমি তে।।
বেদ কৃষ্ণস্য মাহাত্ম্যং বেদাস্য দৃঢভক্তিনাম্।
আত্যাজমস্য জানামি প্রাণৈস্তুল্যং ধনঞ্জয়ম্।।
অন্যৎ কুম্ভাদষাং পূর্ণাদন্যৎ পাদাবসেচনাৎ।
অন্যৎ কুশলসম্প্রশ্নন্নৈষিষ্যতি জনার্দনঃ।।
যৎ ত্বস্য প্রিয়মাতিথ্যং মানার্হস্য মহাত্মনঃ।
তদস্মৈ ক্রিয়তাং রাজন্ মানার্হোসৌ জনার্দনঃ।।

[মহাভারত; উদ্যোগ পর্ব: ৮৮/১০-১৪]

অর্থ- বিদুর ধৃতরাষ্ট্রকে বলছেন, আপনি ধন দিয়ে মহাবাহু শ্রীকৃষ্ণকে নিজের পক্ষে আনতে চাচ্ছেন এবং আপনি আশা করছেন এই উপায়ে আপনি তাকে পাণ্ডবদের থেকে আলাদা করবেন। কিন্তু আমি আপনাকে আসল কথা বলছি- আপনি ধন দিয়ে অথবা কোন উদ্যোগ বা নিন্দা করে শ্রীকৃষ্ণকে অর্জুনের থেকে আলাদা করতে পারবেন না।

আমি শ্রীকৃষ্ণের মাহাত্ম্য সম্পর্কে জানি। শ্রীকৃষ্ণের প্রতি অর্জুনের দৃঢ় ভক্তি আছে। অতএব আমি এটা নিশ্চিত জানি যে, শ্রীকৃষ্ণ নিজের প্রাণের সমান প্রিয় সখা অর্জুনকে কখনো ত্যাগ করবেন না। এজন্য আপনার দেয়া বস্তুর মধ্যে জলপূর্ণ কলস, পা ধৌত করার জন্য জল এবং কুশল প্রশ্ন ছাড়া অন্য কোন বস্তু শ্রীকৃষ্ণ স্বীকার করবেন না। রাজন! সম্মানীয় মহাত্মা শ্রীকৃষ্ণের যে পরম প্রিয় আতিথ্য সেটাই করুন। কারণ জনার্দন

সবার দ্বারা সম্মান পাবার যোগ্য ।

ছিলেন শূদ্রকে আর্যাবর্তের সম্রাটে অধিষ্ঠিত করার পক্ষধর

ভগবান শ্রীকৃষ্ণ বর্ণব্যবস্থার পোষক ছিলেন। তিনি কর্ণকে বলেছিলেন,

সোঽসি কর্ণ তথা জাতঃ পাণ্ডোঃ পুত্রোঽসি ধর্মতঃ।
নিগ্রহাদ্ ধর্মশাস্ত্রাণামেহি রাজা ভবিষ্যসি ॥

[মহাভারত; উদ্যোগপর্ব: ১৪০/৯]

অর্থ– কর্ণ! তোমার জন্মও এই প্রকারে হয়েছে; (কুন্তীর কন্যাবস্থাতেই তুমি উৎপন্ন হয়েছ এবং তুমি তাঁর পুত্র) অতঃ তুমিও ধর্মানুসারে পাণ্ডুর পুত্র। একারণে এসো, ধর্মশাস্ত্রের নিয়মানুসারে তুমি রাজা হবে।
পরন্তু কর্ণ এই প্রস্তাব গ্রহণ করেন নাই।

ছিলেন নির্লোভতার প্রতিচ্ছবি

ভগবান শ্রীকৃষ্ণ কদাচারী, রাক্ষস কংসকে হত্যা করেন, পরন্তু রাজ্যের ভার তিনি গ্রহণ করেন নাই। তিনি তাঁর পিতামহ উগ্রসেনকে রাজার পদে অধিষ্ঠিত করেন–

উগ্রসেনঃ কৃতো রাজা ভোজরাজ্যস্য বর্দ্ধনঃ।

[মহাভারত; উদ্যোগ পর্ব: ১২৮/৩৯]

যখন ভগবান শ্রীকৃষ্ণের সুনিপুণতার নির্দেশে ভীম জরাসন্ধকে হত্যা করেন, তৎপশ্চাৎ শ্রীকৃষ্ণ জরাসন্ধের পুত্র সহদেবের রাজ্যাভিষেক করান—

অভ্যষিঞ্চৎ তমেব জরাসন্ধাত্মজং মুদা।
গত্বৈকত্বং চ কৃষ্ণেন পার্থাভ্যাং চৈব সৎকৃতঃ॥

[মহাভারত; সভাপর্ব: ২৪/৪৩]

অর্থাৎ, তদনন্তর ভগবান শ্রীকৃষ্ণ জরাসন্ধ পুত্র সহদেবকে প্রসন্নতাপূর্বক তার পিতার রাজ্যেই অভিষেক সম্পন্ন করে তাকে অপনা অভিন্ন সুহৃদ্ হিসেবে অধিষ্ঠিত করেন । ভীম এবং অর্জুনও তার আদরতাপূর্ণ সৎকার করেন।

চেদিনরেশ পাষণ্ড শিশুপালকে হত্যার পর তার পুত্রের রাজ্যাভিষেক করানোর নির্দেশ—

চেদীনামাধিপত্যে চ পুত্রস্য মহীপতেঃ।
অভ্যষিঞ্চৎ তদা পার্থঃ সহ তৈর্বসুধাধিপৈঃ॥

[মহাভারত; সভাপর্ব: ৪৫/৩৬]

অর্থাৎ, শিশুপালের অন্ত্যেষ্টি সংস্কারের পশ্চাৎ কুন্তীনন্দন রাজা যুধিষ্ঠির উক্ত স্থানে উপস্থিত সমস্ত রাজার সাথে চেদিদেশ রাজসিংহাসনে শিশুপালের পুত্রকে অভিষিক্ত করেন ।
এ ছাড়াও ভগবান শ্রীকৃষ্ণ ভৌমাসুরকে হত্যা করে তার পুত্র ভগদত্তকে রাজ্যে নিযুক্ত করেন।

ছিলেন দৃঢ়প্রতিজ্ঞ

চলেদ্ধি হিমবাঞ্ছৈলো মেদিনী শতধা ভবেৎ।
দ্যৌঃ পতেচ্চ সনক্ষত্রা ন মে মোঘং বচো ভবেৎ॥

[মহাভারত; উদ্যোগপর্ব: ৮২/৪৮]

অর্থ - যদি হিমালয় পর্বত তার স্থান থেকে সরে যায়, পৃথিবী শত শত টুকরো হয়ে যায় এবং তারাসহ আকাশ ভেঙ্গে পড়ে, তথাপি আমার বচন অসত্য হবে না ।

কৌরব যুবরাজ মূঢ়মতি দুর্যোধনের দৃষ্টিতে ভগবান শ্রীকৃষ্ণ–

শ্রীকৃষ্ণ দুর্যোধনের বিপক্ষে তথা তাঁকে হারানোর মূখ্য কর্ণধার ছিলেন। তবুও শ্রীকৃষ্ণের প্রতি দুর্যোধনের সম্মান ছিলো -

স হি পূজ্যোতমো লোকে কৃষ্ণঃ পৃথুললোচনঃ।
ত্রয়াণামপি লোকানং বিদিতং মম সর্বথা।।

[মহাভারত; উদ্যোগপর্ব ৮৯/৫]

অর্থ - হে বিদুরজী! বিশাল নেত্রযুক্ত শ্রীকৃষ্ণ এই লোকেই নয় বরং ত্রিলোকে সর্বশ্রেষ্ঠ হওয়ার কারণে পরম পূজনীয় পুরুষ, এই কথা আমার ভালোভাবে জ্ঞাত।

ছিলেন সংবেদনশীল হৃদয়ের প্রতিবিম্ব

ভগবান শ্রীকৃষ্ণের সংবেদনশীলতার প্রভাবে কুরুরাজ ধৃতরাষ্ট্র বলেছেন –

এবমেতন্ মহাবাহো য়থা বদসি মাধব ।
পুত্রস্নেহস্তু বলবান্ ধৈর্যান্মাং সমাচলৎ ॥

[মহাভারত; স্ত্রীপর্ব: ১৩/১৩]

অর্থ- মহাবাহো ! মাধব ! আপনি যেরূপ ব্যক্ত করেছেন, তদ্রুপ এমনটাই বিষয় । পরন্তু পুত্র স্নেহ প্রবল হওয়ার দরুন, সে আমাকে ধর্ম থেকে বিচলিত করে দিয়েছিলো ।

ছিলেন ব্রহ্মচর্যের সদামূর্তি

ব্রহ্মচর্য্যং মহদ্ ঘোরং চীর্ত্বা দ্বাদশবার্ষিকম্ ।
হিমবৎ পার্শ্বমভ্যেত্য যো ময়া তপসার্জিতঃ ll
সমান ব্রতচারিণ্যাং রুক্মিণ্যাং যোহম্বজায়ত ।
সনৎকুমার তেজস্বী প্রদ্যুম্নো নাম মে সুতঃ ।।

[মহাভারত; সৌপ্তিক পর্ব: ১২/৩০,৩১]

অর্থ - ভগবান শ্রীকৃষ্ণ তাঁর স্বীয় পত্নি রুক্মিনীর সাথে হিমালয়ে ১২ বছরের মহান ঘোর ব্রহ্মচর্য ব্রত ধারণ করে তপস্যা করেছিলেন । দুইজনে সনৎ কুমারের ন্যায় তেজস্বী পুত্র প্রদ্যুম্ন নামক পুত্র উৎপন্ন করেছিলেন ।

ছিলেন পরম মিত্র

ভগবান শ্রীকৃষ্ণ ছিলেন পরম মিত্রতার প্রতীক।

পাণ্ডুপুত্র ধর্মরাজ যুধিষ্ঠিরকে তিনি বলেন –
তব ভ্রাতা মম সখা সম্বন্ধী শিষ্য এব চ ।
মাংসান্যুৎকৃত্য দাস্যামি ফাল্গুনার্থে মহীপতে ॥

[মহাভারত; ভীষ্মপর্ব: ১০৭/৩৩]

অর্থ - আপনার ভ্রাতা অর্জুন আমার মিত্র, সম্বন্ধী এবং শিষ্য । তার হিতের জন্য আমার স্বীয় অঙ্গের মাংসও কর্তন করতে প্রস্তুত ।

ধর্মরাজ যুধিষ্ঠিরের দৃষ্টিতে ভগবান শ্রীকৃষ্ণ -

বয়ং রাজ্যমনুপ্রাপ্তাঃ পৃথিবী চ বশে স্থিতা।
তব প্রসাদাদ্ ভগিংস্ত্রিলোকগতিবিক্রম।।
জয়ং প্রাপ্তা যশাশ্চাগ্রং ন চ ধর্মচ্যুতা বয়ম্।।

[মহাভারত; শান্তিপর্ব: ৪৫/১৮,১৯]

অর্থ - বুদ্ধিমানদের মধ্যে শ্রেষ্ঠ শ্রীকৃষ্ণ! আপনার কৃপাতে আমরা এই রাজ্য পেয়েছি। ভগবান্! আপনি তিনলোকে আশ্রয় এবং পরাক্রম। আপনার কৃপাতেই আমরা বিজয় তথা উত্তম যশ প্রাপ্ত করেছি এবং ধর্মচ্যুত হই নি।

ছিলেন বিনম্রতার পরমাদর্শ

চরণক্ষালনে কৃষ্ণো ব্রাহ্মণানাং স্বয়ং হ্যভূৎ ।
সর্বলোকসমাবৃত্তঃ পিপ্রীষুঃ ফলমুত্তমম্ ॥

[মহাভারত; সভাপর্ব: ৩৫/১০]

অর্থাৎ, ভগবান শ্রীকৃষ্ণ যখন বেদব্যাস, ধৃতরাষ্ট্র, কুন্তী এবং যুধিষ্ঠির আদি গুরুজনদের সমক্ষে উপস্থিত হতেন তখন তাঁদের চরণ স্পর্শ করে প্রণাম করতেন ।

ততোঽব্রবীদ বাসুদেবোঽভিগম্য,
কুন্তীসুতং ধর্মভৃতাং বরিষ্ঠম্।
কৃষ্ণোঽহমস্মীতি নিপীড্য পাদৌ,
যুধিষ্ঠিরস্যাজমীঢস্য রাজ্ঞঃ॥

[মহাভারত; আদিপর্ব: ১৯০/২০]

অর্থ- ‘ আমি কৃষ্ণ’, এরূপ নিজের পরিচয় দিয়ে তিনি আজমীঢ়বংশী রাজা যুধিষ্ঠিরের চরণ স্পর্শ করলেন ।

ছিলেন সত্যনিষ্ঠ

ন ব্রবীমুত্তরে মিথ্যা সত্যমেতদ্ভবিষ্যাত
এব সঞ্জীবয়াম্যেনং পশ্যতাং সর্ব্বদেহিনম্ ।
নোক্তপূর্ব্বং ময়ামিথ্যা সৈরেস্বপি কদাচন,
ন চ বদ্ধাৎ পরাবৃত্তস্তথা সঞ্জীবতামরম্ ।
যথা সত্যঞ্চ ধর্ম্মশ্চ ময়িনিত্যং প্রতিষ্ঠিতৌ,
তথা মৃতঃ শিশুররং জীবিতাদভিমন্যুজঃ ।।

[মহাভারত; অশ্বমেধ পর্ব: ৬৩/১৮,১৯,২২]

অর্থাৎ, ভগবান শ্রীকৃষ্ণ কখনও মিথ্যা বলতেন না, এমনকি হাস্য-পরিহাসেও নয় ।
সত্য ও ধর্মই তাঁর মধ্যে নিত্য প্রতিষ্ঠিত ছিল। তিনি (ধর্ম) যুদ্ধে কখনো পৃষ্ঠ প্রদর্শন করতেন না ।

তিনি তাঁর পবিত্রতার শক্তিতেই বলেছিলেন, যদি সত্য ও ধর্ম আমার মধ্যে নিত্য প্রতিষ্ঠিত থাকে, তবে তার প্রভাবে এই অভিমন্যুর মৃতপুত্র জীবিত হয়ে উঠুক। আর সত্য সত্যই মৃতপুত্র জীবিত হয়েছিল।

সুতরাং, স্পষ্টত সত্য প্রতীয়মান যে, যদি ভগবান শ্রীকৃষ্ণ অশ্লীল, ব্যভিচারী পুরাণ অনুসারে রাসলীলাদির মতো ব্যভিচার করতেন, তাহলে তাঁর শপথ অনুযায়ী সত্য ও ধর্মের অমোঘ প্রভাব প্রকাশ পেত না।

পুরাণ অনুসারে রাসলীলাকারী, গোপীদের সাথে যৌন ক্রীড়াকারি কলুষিত চরিত্র ব্যক্তির আবার সত্য ও ধর্ম কোথায় ? কাজেই মনুষ্যরচিত কপোলকল্পিত ভাগবত পুরাণে উল্লেখিত রাসলীলা, কুব্জা ঘটিত প্রসঙ্গ একেবারেই মিথ্যা, ভাগবত
পুরাণও সম্পূর্ণভাবে অস্তিত্বহীন, মিথ্যা।

ভগবান শ্রীকৃষ্ণ ছিলেন সর্বগুণে গুণান্বিত। তাঁর গুণ সম্বন্ধে লেখা শেষ করা অসম্ভব।
এইজন্যই মহামহিম পিতামহ ভীষ্ম বলেছেন –

জ্ঞানবৃদ্ধো দ্বিজাতীনাং ক্ষত্রিয়াণাং বলাধিকঃ।
বৈশ্যানাং ধান্যধনতঃ শূদ্রাণামেব জন্মতঃ।।
বেদবেদাঙ্গবিজ্ঞানং বলং চাভ্যধিকং তথা।
নৃণাং লোকে হি কোঽন্যোঽস্তি বিশিষ্টঃ
কেশবাদৃতে।।
দানং দাক্ষ্যং শ্রুতং শৌর্যং হ্রীঃ কৃর্ত্তির্বুদ্ধিরুত্তমা।
সন্নতিঃ শ্রীর্ধৃতিঃ পুষ্টিস্তুষ্টিশ্চ নিয়তাচ্যুতে।।
[মহাভারত; সভাপর্ব: ৩৭/১৬-১৮]

অর্থ - ব্রাহ্মণগণের মধ্যে যিনি জ্ঞানবৃদ্ধ, তিনিই পূজনীয়। ক্ষত্রিয়গণের মধ্যে যিনি অধিক বলশালী, তিনিই পূজনীয়। বৈশ্যগণের মধ্যে যার ধন ও ধান্য অধিক তিনিই পূজনীয় আর শুদ্রগণের মধ্যে যিনি বয়োবৃদ্ধ, তিনিই পূজনীয়। পূজ্যতাবিষয়ে কৃষ্ণের দুটি কারণই আছে - এক বেদ ও বেদাঙ্গের জ্ঞান এবং দ্বিতীয় - অপরিমিত বল। অতএব ভূমণ্ডলে কৃষ্ণ ভিন্ন অন্য কোন ব্যক্তি প্রধান আছে? তারপর দান, কার্যদক্ষতা, শাস্ত্রজ্ঞান, বীরত্ব, লজ্জা, কীর্তি, উত্তম বুদ্ধি, বিনয়, লক্ষ্মো, ধৈর্য, পুষ্টি ও তুষ্টি - এ সমস্তই কৃষ্ণে সর্বদা বিদ্যমান আছে।

বেদ বেদাঙ্গ বিজ্ঞানং বলং বাচ্যধিকং তথা ।
নৃণাং লোকে হি কোহন্যোস্তি বিশিষ্টঃ
কেশাবাবৃতে ।।
দানং দাক্ষ্যং শ্রুতং শৌর্যং হ্রিং কীর্ত্তিবুদ্ধিরুত্তমা।
সন্নতি শ্রীধৃতিস্তুষ্টিঃ পুষ্টিশ্চ নিয়তাচ্যুত্যে ।।
[মহাভারত; সভাপর্ব: ৩৮/১৯,২০]

অর্থ - বেদ বেদাঙ্গ , বিজ্ঞান এবং বল আদি সব গুণ শ্রীকৃষ্ণের মধ্যে বিদ্যমান । মনুষ্য লোকে কেশবের অতিরিক্ত আর কে অধিক গুনসম্পন্ন?

কুরুরাজ ধৃতরাষ্ট্র বলেছেন –

অর্জুনঃ কেশেস্যাত্মাকৃষ্ণোষ্যাত্মা কিরীটিনঃ।
অর্জুন বিজয়ো নিত্যং কৃষ্ণে কীর্তিশ্চ শাশ্বতী।।
সর্বেষ্বপি চ লোকেষু বীভৎসুপরাজিতঃ।
প্রাধান্যেনৈব ভূয়িষ্ঠমমেয়াঃ কেশবে গুণাঃ।।
[মহাভারত; দ্রোণপর্ব: ১১/৩৮,৩৯]

অর্থ- অর্জুন শ্রীকৃষ্ণের আত্মা এবং শ্রীকৃষ্ণ কিরীটধারী অর্জুনের আত্মা। অর্জুনের মধ্যে নিত্য বিজয় বিদ্যমান এবং শ্রীকৃষ্ণে কীর্তির সনাতন নিবাস। অর্জুন সম্পূর্ণ লোকে কখনো কোথাও পরাজিত হয় নি। আর শ্রীকৃষ্ণের মধ্যে এতো গুণ রয়েছে যা গুণে শেষ করা যাবে না।

নমস্কার
বিদুষাং বশংবদঃ

ভগবান শ্রীকৃষ্ণের পুনরায় আবাহন

শ্রী সোমনাথ ঘোষ

ভারতবর্ষ ভগবান শ্রীকৃষ্ণের জন্মভূমি, এ কথা মনে পড়লেই ভাবি বাস্তবিক কি তাই? ভারতবর্ষকে যদি শ্রীকৃষ্ণের জন্মভূমি বলি তাহলে কর্মভূমি বলব কোনটাকে? আর লীলাভূমিই বা বলব কোন স্থানকে? ভারতবর্ষ যে শ্রীকৃষ্ণের সবটা। এটা তাঁর জন্মভূমি, কর্মভূমি, লীলাভূমি বলেই শ্রীকৃষ্ণ নিজেকে ভারতবর্ষ হতে পৃথকভাবে চিন্তা করতে পারেন নাই। ভারতবর্ষের গোটা শরীরটাই কৃষ্ণ। কৃষ্ণ ছাড়া কি ভারতবর্ষকে চিন্তা করা যায়? না, ভারতবর্ষ ছাড়া কৃষ্ণকে চিন্তা করা যেতে পারে? কৃষ্ণের জন্ম ভারতবর্ষেই সম্ভব—আর কোথাও সম্ভব নয়। এই কারণেই জন্মাষ্টমী বললে লোকে শ্রীকৃষ্ণ জন্মষ্টমীর কথা চিন্তা করে। বৎসর ভর তো কত অষ্টমী কেটে যায়, কৈ এক দিনের জন্যও তো কেহ ভাবে না আজ শ্রীকৃষ্ণের জন্মাষ্টমী!

ভারতীয় আর্যজাতি সেই প্রাণের দেবতাটিকে ভুলতে পারে নাই বলেই, স্মরণীয় কালের যে দিনটিতে ভগবান শ্রীকৃষ্ণ জন্মগ্রহণ করেছিলেন অত্যাচারী রাজা কংসের কারাগারে, সেই পূণ্য দিনটাকে আর্যজাতি আজও প্রতিপালন করে আসছে। শ্রীকৃষ্ণকে আর ভুলতেও পারবে না– ভুলে যাবার হলে এতদিন সেটা বিস্তৃতির অতল গহ্বরে তলিয়েই যেত।

প্রতি বৎসর আমরা এই পুণ্য তিথিতে শ্রীকৃষ্ণের কত সংকটময়, গৌরবময় ও যশোময় জীবন বৃত্তান্ত স্মরণ করে আত্মতৃপ্তি লাভ করি। শ্রীকৃষ্ণ জন্মের পবিত্র অষ্টমী তিথিটি অতীতের সমস্ত ইতিহাসকে আমাদের চোখের সামনে তুলে ভাবি সেই কারাগারেরই কথা, সেখানে ভগবান শ্রীকৃষ্ণের শৃংখলিত পিতা ও মাতা কংসের অসহনীয় নির্যাতনকে নীরবে বুকে এঁকে নিয়ে অহর্নিশা বিধাতার কাছে—"প্রভো, এবার শুধু একটি সন্তান চাই।" জননী দেবকীর দুর্জয় সংকল্প-এ গর্ভে বীর্যবান প্রতাপশালী সন্তানের জন্ম হবে।

কংস সে তার আপন নিধন ভয়ে, আপন মৃত্যুভয়ে ভীত সন্ত্রস্ত হয়ে একে একে নাশ করেছে দেবকী-গর্ভজাত সাত-সাতটা শিশুকে। অত্যাচারী রাজা কংস ! তুমি কি ভেবেছ তোমার ঐ দেহে তোমার আত্মা চিরকাল থাকবে না।তোমার দেহ-ই বা কতদিন থাকবে? 'কাল' যখন আসবে তখন সে তোমার "কাল" রূপেই আসবে। জননীর আকুল প্রার্থনা, "ওগো বিশ্বম্ভর। অত্যাচারী কংসের নিধন মানসে আমি একটা 'কাল' সন্তান চাই। শুধু একটা প্রভো, কেবল একটা হলেই হবে ; যে আসবে সে অত্যাচারী মানবের পক্ষে কাল-স্বরূপ হবে।" জননীর আকুল প্রার্থনা ও শিবসংকল্প তার অন্তরকে দিবানিশা দুষ্টের দমন ও শিষ্টের পালনকারীর আবির্ভাব প্রতীক্ষায় কানায় কানায় পূর্ণ করে তুলেছে।

অশান্তময় জগতে শান্তির পুনঃ প্রতিষ্ঠার সংকল্প যেখানে অটল, শিষ্টের পালন ভাবনা সেখানে কল্যাণকারিণী; দুষ্ট ও অত্যাচারীর বুকে প্রচণ্ড আঘাত হেনে অত্যাচারের ভীম কারাকে চূর্ণ বিচূর্ণ করার বাসনা যেখানে ঊদগ্রীব সেখানে চরম দণ্ডের প্রতীক স্বরূপ 'কাল' জন্ম পরিগ্রহ করবে না তো কে করবে? তাই দেখি জননীর বহুদিনের সাধনা সফল হল। কংসের কারা প্রাচীরের অন্তরালে 'কাল', জননী দেবকীর ক্রোড়কে আশ্রয় করে জন্ম নিল। এ 'কাল' দেবকীর 'কাল' নয়—এ 'কাল' কংসের 'কাল'। এ 'কাল' তার জননীকে দেখা দিলেন অত্যাচারের মূর্ত্ত সংহারক অভয়ঙ্কর রূপে আর কংসকে দেখা দিয়েছিলেন 'কাল' ভয়ঙ্কর রূপে। দেবকী-সূত কংসের 'কাল'—কংসের মৃত্যু, লোকে প্রচারিত হল বাসুদেব-'কাল'। সাধু সেই 'কাল'কে সাধুভাষায় বর্ণনা করলেন—কৃষ্ণ। আর যিনি সুন্দরের উপাসক তিনি কৃষ্ণকে শ্রীমণ্ডিত করে বললেন—শ্রীকৃষ্ণ। এইরূপ কৃষ্ণের জন্ম হয়েছিল জন্মাষ্টমীর দিন,লোকে এই তিথিটির নাম দিয়েছে শ্রীকৃষ্ণ জন্মাষ্টমীর দিন, লোকে এই তিথিটির নাম দিয়েছে "শ্রীকৃষ্ণ জন্মাষ্টমী।"

সেদিন ভারতবর্ষের কি ঘোর দুর্দিন। স্থানে স্থানে অসুরের অত্যাচার, রাজা কংসের অত্যাচর, দানবে মানবে সংঘর্ষ, অসুরে দেবতার সংগ্রাম, এমনি আরও কত অত্যাচার যে ভারতের বুকে তাণ্ডবলীলা করছিল তার ইয়ত্তা কোথায়? সেসব ইতিহাস আজ আর নেই? যদি বিদেশী যবনদের আক্রমণে ভারতবর্ষ জর্জরিত না হত তাহলে অবশ্যই সেই সব ইতিহাসের সন্ধান পাওয়া যেতো। কারণ এই সেদিন ভারতে ইংরাজ আগমনের পূর্বে, একদল ভারতবর্ষের কৃষ্টি সভ্যতা ও ধর্মের বহু মূল্যবান পুঁথিপত্র জ্বালিয়েছে, পুড়িয়েছে, আর ভারতের ঐশ্বর্য্য লুণ্ঠন করে নিয়ে গিয়েছে ওগো, দুই হাতে লুঠ করে নিয়ে গিয়েছে তারা ভারতীয় সভ্যতার বুকে বারংবার আঘাত হেনেছে সে সব দাগ ভারতের বুকে আজও আছে। আক্রমণকারীরা সোমনাথের মন্দিরকে বারংবার ধ্বসিয়ে ফেলেও নিশ্চিহ্ন করতে পারে নাই সেই প্রাচীন স্থাপত্যের ভিত্তির উপর সোমনাথের মন্দির আবার উন্নত মস্তকে আকাশকে চুম্বন করতে উদ্যত। এ সোমনাথ শ্রীকৃষ্ণের রাজ্যবর্ত্তী সোমনাথ। ভারতে আবার ভগবান শ্রীকৃষ্ণের উত্থান হচ্ছে। যদি তাই না হত, তাহলে শ্রীকৃষ্ণের শেষ নিঃশ্বাস ভূমিকে আবার নূতন করে গড়ে তোলা হত না।

শ্রীকৃষ্ণের জন্ম হচ্ছে দুর্দিনের মাঝে। সেই মহামানবের জন্মক্ষণ প্রতিপালনের সময় আজ যেমন আমরা মন্দিরকে শঙ্খ, ঘণ্টা ধ্বনিতে মুখরিত করে তুলি—তার আগমন সূচনায়, সেদিন কিন্তু শ্রীকৃষ্ণের সেভাবে জন্মসূচনা বিঘোষিত করা হয় নাই। সেদিন প্রকৃতি তার আগমন উদ্ঘোষ করেছিল বজ্রের ভয়ঙ্কর গর্জনে ; সেদিন কারাগৃহে প্রদীপ জ্বলে নাই, জননী কৃষ্ণের মুখ দেখেছিলেন—সৌদামিনীর ঝলক ঝলকে। দেবকীর সাধনার ধন তার বুকে আজ অফুরন্ত আশার
প্রবল বন্যা বহিয়ে দিয়েছে। জননীর মুখে হাসি ফুটেছে। বন্ধন-বেদনা তিরোহিত মায়ের আশা, মায়ের আনন্দ–এবার অত্যাচারের বিনাশ হবে ; কী বিপুল আশা জননীর বুকে। ভারতের মা এমনিই।

নরনারী আজ শ্রীকৃষ্ণের জয়ঘোষে দিগ্‌দিগন্ত মুখরিত করে তুলেছে। শ্রীকৃষ্ণের চরিত্র বল তাঁর বীর্য– তেজ, অসীম পরাক্রম স্মরণ করে কত কবি, কত লেখক, তাদের কাব্যে, গাথায়, গানে শ্রদ্ধাঞ্জলি নিবেদন করেছে, কিন্তু যে জননী সাধনা করল প্রতি নিয়ত দেশকে জাতিকে–অত্যাচারের নিষ্ঠুর কবল হতে মুক্ত করার জন্য যে জননী কারা প্রাচীরের অন্তরালে তপস্যা করল অরিন্দম পুত্রের জন্য—যে জননী দিনের পর দিন মাসের পর মাস ভাবি সন্তানের চিত্ত ও মন গঠনের ধ্যানে নিরতা ছিল, সে দুঃখিনী জননী দেবকীর কথা আজ কেহ তো চিন্তা করে না। ভারতের যত মহাপুরুষ ও মহামানব এসেছেন—গিয়েছেন, দেশবাসী তাঁদের জন্মোৎসব পালন করে থাকে,

তাঁদের কীর্তি-গাথার উদ্গান করে। কিন্তু যাঁরা এঁদের জননী, কৈ তাঁদের উদ্দেশ্যে দেশবাসী উৎসব করে না তো? এ বিষয়ে ভারতীয় আর্যজাতি এত উদাসীন কেন? এর উত্তর আজ কে দেবে?

আর্যজাতি! আজ এই জন্মাষ্টমীর দিন নারীজাতি মাতৃজাতিকে সম্বোধন করে
বলতে হবে—ওগো জননী! তোমাদের মতই এক মা ভারতের মহাদুর্দিনে কঠোর তপস্যা করে শ্রীকৃষ্ণকে গর্ভে ধারণ করেছিলেন। মা তোমরাই পারো—এ ক্ষমতা ভগবান তোমাদেরই একচেটে করে দিয়েছেন : শঙ্কর রামমোহন, অরবিন্দ, দয়ানন্দ, বিবেকানন্দ, ঈশ্বরচন্দ্র ও রবীন্দ্রনাথের মত কত সন্তানকে ভারতের মাতৃশক্তিই তো ধারণ করেছে। স্বাধীন শীর্ণ ভারতে আজ মহা দুর্দিন ; এই দুর্দিনে শক্তিশালী বলবান সন্তান চাই। জননী আজ সংকল্প করো, প্রতিজ্ঞা করো, তোমার গর্ভে চরিত্রহীন সন্তানের জন্ম হবে না। হীনবীর্য, ভীরু কাপুরুষ সন্তানকে তুমি তোমার হিরণ্যগর্ভে স্থান দেবে না : স্বার্থপর, মৃত্যুভয়ে ভীত মানব তোমার গর্ভে জন্ম নিয়ে নারীত্বের—মাতৃত্বের আবমাননা করবে না। তোমার গর্ভে দেবতা আসবে যার প্রভায় ধরায় তিমির রাত্রি কেটে গিয়ে দলিত মানবের আশাহীন আন্ধকারাচ্ছন্ন ভগ্ন বুকে আশার বিমল আলোক ফুটে উঠবে বিশ্বের দুঃখ পীড়িত নরনারী তোমার সন্তানকে বলবে তুমি আমাদের দুঃখ বন্ধন মোচন করেছ তুমি আমাদের বরেণ্য।

সেদিন যেমন শ্রীকৃষ্ণের প্রয়োজন ছিল আজও তেমনি ধর্মরাজ্যের পুনঃপ্রতিষ্ঠার জন্য শ্রীকৃষ্ণের প্রয়োজন আছে। শুধু কৃষ্ণ এস, কৃষ্ণ এস বলে, দরবিগলিত ধারায় অশ্রুবর্ষণ করে, ভক্তিরসের অবতারণা করলে শ্রীকৃষ্ণ আসেনা। শ্রীকৃষ্ণ আসে পিতা-মাতার সঙ্কল্প শক্তিতে, যেভাবে সঙ্কল্প করেছিলেন পিতা বাসুদেব ও মাতা দেবকী।
একটা মানুষ, সে তার এক জীবনে কৃষ্ণকে জানতে পারে না। শ্রীকৃষ্ণের অদ্ভুত গুণরাজি এতই অধিক যা নাকি সাধারণ মানুষের কল্পনারও অতীত। কৃষ্ণকে যখন সাধারণ বুদ্ধি তার গণ্ডির মধ্যে আটকাতে পারে না, তখন কৃষ্ণ হয়ে যায় সাধারণের নিকট ঈশ্বরের মত। কৃষ্ণের সারল্য, মাধুর্য, বীরত্ব, পরাক্রম,দানশীলতা, রাজনীতিজ্ঞতা আদি যত গুণের কথাই বলুন না কেন, তাঁর এত গুণ দেখে, মানুষ একই সময়ে তাঁকে সবদিক দিয়ে চিনতে পারে না। কৃষ্ণকে জানা অসম্ভব, বিশেষ করে অজ্ঞানান্ধের পক্ষে যাদের জ্ঞান চক্ষু নেই—যারা জ্ঞান-চক্ষুহীন, তাদের পক্ষে অন্ধের হাতী দেখা যেমন চক্ষুষ্মানের কাছে হাস্যকর, শ্রীকৃষ্ণকে অজ্ঞানীর পক্ষে জানাও তেমনি হাস্যকর।

তাই আসুন সবাই সাধ্যমতো ভগবান এর জীবনী সম্পর্কে জানার চেষ্টা করি।ভগবানের আদর্শ যেন বুকে ধারণ করে এগিয়ে যেতে পারি।সবাইকে জন্মাষ্টমীর অনেক অনেক শুভেচ্ছা জানিয়ে লেখাটি শেষ করছি।

ওঁম্ কৃণ্বন্তো বিশ্বমার্যম।।
ওঁম্ শান্তিঃ শান্তিঃ শান্তিঃ।।

সনাতন ধর্মের মহান পুরুষ যোগেশ্বর ভগবান শ্রী কৃষ্ণ

শ্রী শাশ্বত চক্রবর্তী

আজ থেকে ৫২৪৯বছর আগে ভাদ্রপদ মাসের কৃষ্ণপক্ষের অষ্টমী তিথিতে রোহিণী নক্ষত্রে এক মহাত্মার জন্ম হয় যিনি তার অসামান্য জ্ঞান ও কর্মের জন্য এই ভুবনে ভগবান শ্রী কৃষ্ণ নামে পরিচিত হন।

শ্রী কৃষ্ণ ছিলেন একজন আদর্শ অনুসরণীয় ব্যক্তিত্ব তা শ্রীকৃষ্ণের জীবনী পর্যালোচনা করলেই জানা যায়।

সবাই তো শ্রী কৃষ্ণের কংস বধের বীর গাথা কম-বেশি শুনেছেন নিশ্চয়ই। শ্রী কৃষ্ণ তখন উঠতি কিশোর ছিলো। কংসের অত্যাচারে সবাই অতিষ্ঠ হয়ে পরেছিল। দন্দ্ব যুদ্ধই একমাত্র উপায় ছিলো। বলরাম এবং শ্রীকৃষ্ণকে কংস মল্লযুদ্ধে আহবান করলো।তারপর শ্রীকৃষ্ণ হাতে কংসের মৃত্যু ঘটলো।

মহাভারতের দ্রোণ পর্বে ধৃতরাষ্ট্র কংস বধ সমন্ধে বলছেন —

"মহাবলবান তেজস্বী জরাসন্ধের দ্বারা পালিত কংসকে তার সাথী সহিত যুদ্ধে শ্রীকৃষ্ণ মেরে ফেল্লেন।"(মহাঃ দ্রোণ পর্ব ১১।৬)

মহাভারতের সভাপর্বে স্বয়ং শ্রীকৃষ্ণ যুধিষ্ঠিরকে বলছেন —

"দুষ্টমতি কংস জরাসন্ধের দুই কন্যাকে বিবাহ করে তার শশুরের সহায়তায় নিজ জাতিদের উপর পিড়ন করেছিলো তাই আমি এবং বলরাম কংসকে বধ করি।" (মহাঃ সভা পর্ব ১৪।৩৪)

ভগবান শ্রী কৃষ্ণ ছিলেন সর্বগুনে গুনান্বিত | তার ব্যক্তিত্ব আমাদের জীবনের উজ্জ্বলতম আদর্শ ও অনুকরণীয়।

শ্রী কৃষ্ণের গুন নিয়ে মহামহিম ভীষ্ম মহাভারতের সভা পর্বে বলছেন -

"বেদ-বেদাঙ্গ,বিজ্ঞান এবং বল আদি সব গুণ শ্রীকৃষ্ণের ভিতর বিদ্যমান। মনুষ্যলোকে কেশবের অতিরিক্ত আর কে অধিক গুণসম্পন্ন?"
(মহাঃ সভা পর্ব ৩৮।১৯-২০)

তাঁর গুন নিয়ে মহাভারতের অশ্বমেধিক পর্বের একটি শ্লোক দেখা যাক-

"ভগবান শ্রীকৃষ্ণ কখনো মিথ্যা বলতেন না, এমনকি হাস্য পরিহাসও না। সত্য ও ধর্মই তার মধ্যে নিত্য প্রতিষ্ঠিত ছিল। তিনি (ধর্ম) যুদ্ধে কখনো পৃষ্ঠ প্রদর্শন করতেন না।"
(মহাভারত অশ্বমেধিক পর্ব ৬৩/১৮-২২)

যোগেশ্বর ভগবান শ্রী কৃষ্ণের রাজনৈতিক দক্ষতা

শ্রীকৃষ্ণের মতো জ্ঞানী আর কেউই ছিলো না। তিনি একাধারে যেমন বেদ- বেদাদীশাস্ত্র, জ্ঞান-বিজ্ঞান এ জ্ঞানী ছিলেন তেমনি তার ছিলো প্রগাঢ় রাজনৈতিক দক্ষতা।

শ্রীকৃষ্ণের রাজনৈতিক দক্ষতার বলেই পান্ডবগন যুদ্ধে জয় লাভ করেছিলো। শত শত রাজবংশ একজন সম্রাটের অধীনে এসে গেলো। খন্ড খন্ড ভারত— মহাভারত হয়ে গেলো এবং এগুলো সবকিছু কিন্তু শ্রীকৃষ্ণের রাজনৈতিক দক্ষতার ফলেই সম্ভব হয়েছিলো। শ্রীকৃষ্ণ একজন সম্রাটের পতাকার তলে এক সংঘ শাসনের স্থাপনা করে ফেলেছিলেন।
শ্রী কৃষ্ণের রাজনৈতিক দক্ষতা নিয়ে মহাভারতের সভা পর্বের একটি শ্লোক দ্রষ্টব্য:-

"বীরশ্রেষ্ঠ যে ক্ষত্রিয় অপর ক্ষত্রিয়কে জয় করিয়া বশে আনিয়া আবার ছাড়িয়া দেন,তিনি তাহার গুরু হইয়া থাকেন।রাজাদের এই সভায় আমি এমন একটি রাজাকেও দেখিতেছি না,যিনি যুদ্ধে কৃষ্ণে পরাক্রমে বিজিত হন নাই।এই কৃষ্ণ কেবল আমাদেরই পূজনীয় নহেন,এই মহাবাহু ত্রিভুবনের সমস্ত লোকেরই পূজনীয়।"
(মহাঃ সভা পর্ব ৩৭।৭-৯)

শ্রী কৃষ্ণের বিবাহ প্রসঙ্গ :

কৃষ্ণের প্রথম ভার্যা রুক্মিণী। ইনি বিদর্ভরাজ্যের অধিপতি ভীষ্মকের কন্যা। তিনি অতিশয় রূপবতী এবং গুণবতী শুনে কৃষ্ণ ভীষ্মকের নিকট রুক্মিণীকে বিবাহার্থ প্রার্থনা করেছিলেন। রুক্মিণীও কৃষ্ণের অনুরক্তা হয়েছিলেন। কিন্তু ভীষ্মক কৃষ্ণশত্রু জরাসন্ধের পরামর্শে রুক্মিণীকে কৃষ্ণে সমর্পণ করতে অসম্মত হলেন। তিনি কৃষ্ণদ্বেষক শিশুপালের সঙ্গে রুক্মিণীর বিবাহ স্থির করে দিনাবধারণপূর্বক সমস্ত রাজগণকে নিমন্ত্রণ করলেন। যাদবগণের নিমন্ত্রণ হল না। কৃষ্ণ স্থির করলেন যাদবদিগকে সঙ্গে লইয়া ভীষ্মকের রাজধানীতে যাবেন এবং রুক্মিণীকে তাঁর বন্ধুবর্গের অসম্মতিতেও গ্রহণ করে বিবাহ করবেন।
কৃষ্ণ তাই করলেন। বিবাহের দিন রুক্মিণী দেবারাধনা করে দেবমন্দির হতে বাহির হলে, কৃষ্ণ তাঁকে রথে তুললেন। ভীষ্মক ও তাঁর পুত্রগণ এবং জরাসন্ধ প্রভৃতি ভীষ্মকের মিত্ররাজগণ কৃষ্ণের আগমনসংবাদ শুনেই এইরূপ একটা কাণ্ড উপস্থিত হবে বুঝেছিলেন। অতএব তাঁরা প্রস্তুত ছিলেন। সৈন্য নিয়ে
সকলে কৃষ্ণের পশ্চাৎ ধাবিত হলেন। কিন্তু কেহই কৃষ্ণকে ও যাদবগণকে পরাভূত করতে পারিলেন না। কৃষ্ণ রুক্মিণীকে দ্বারকায় নিয়ে গিয়ে যথাশাস্ত্র বিবাহ করিলেন।

শ্রীমদভগবদগীতা প্রসঙ্গ

মহাভারতের ভীস্মপর্বের অংশ ৭০০ শ্লোক ও ১৮ অধ্যায় সমৃদ্ধ শ্রীমদভগবদগীতা পৃথিবীর অন্যতম শ্রেষ্ঠ দর্শন শাস্ত্রের উদাহরণ |
যা যোগেশ্বর ভগবান শ্রী কৃষ্ণের অমূল্য দান |

শ্রীমদ্ভগবদগীতার একটা উক্তি দিয়ে শেষ করব

যত্র যোগেশ্বরঃ কৃষ্ণো যত্র পার্থো ধনুর্ধরঃ ।
তত্র শ্রীর্বিজয়ো ভূতির্ধ্রুবা নীতির্মতির্মম ॥
(১৮/৭৮)॥

অর্থাৎ, যে পক্ষে বাসুদেব ও অর্জ্জুন অবস্থান করিতেছেন, তাহাদিগেরই রাজ্যলক্ষ্মী, জয়, অভ্যুদয় ও নীতি লাভ হইবে।
শ্রী কৃষ্ণের মত মহান ব্যক্তিত্বকে নিয়ে এক লিখনিতে লেখা সম্ভব না। এই লিখনিতে যোগেশ্বরের জীবনের সংক্ষিপ্ত বিবরণ দেওয়া হয়েছে। পরিশেষে দুর্যোধনের শ্রী কৃষ্ণকে নিয়ে মহাভারতের একটি শ্লোক দিয়েই সমাপ্তি করি –

স হি পূজ্যোতমো লোকে কৃষ্ণঃ পৃথুললোচনঃ।
ত্রয়াণামপি লোকানং বিদিতং মম সর্বথা।।
(মহাঃ উদ্যোগ ৮৯।৫)
"-হে বিদুরজী! বিশাল নেত্রযুক্ত শ্রীকৃষ্ণ এই লোকেই নয় বরং ত্রিলোকে সর্বশ্রেষ্ঠ হওয়ার কারণে পরম পূজনীয় পুরুষ, এই কথা আমার ভালোভাবে জ্ঞাত।"

জয় শ্রী কৃষ্ণ

বিশ্বজয়ী শ্রীকৃষ্ণ

শ্রী সজীব বিদ্যার্থী

শব্দ আর বাক্যে তোমায় রাখা যায়?
তোমায় রাখি আমার অব্যক্ত প্রার্থনায়!

শ্রীকৃষ্ণ মানে অধ্যাত্ম জগতের এক অনন্য মহা বিজ্ঞান মনে হয় তাই যা লিখি তাই তুচ্ছ মনে হয় । তাই অনুভবেই প্রশান্তি আমার তাকে নিয়ে ভাবলে এক অসাধারণ বুদ্ধিমত্তাকে নিজের মধ্যে অনুভব করি। বিশ্ব ব্রহ্মাণ্ড সবাই বলে অসীম সেই অসীমত্বকে যেনো এই এক পুরুষের গুন কর্মের থেকেও ছোটো দেখা যায়।

পৃথিবীতে যে কয়জন মুক্ত পুরুষের বিচরণ ঘটেছে, সর্বাকর্ষক এবং সত্যের ইতিহাস সৃষ্টিকারীদের মধ্যে যোগেশ্বর শ্রীকৃষ্ণ অন্যতম। হ্যাঁ তিনি যোগেশ্বর যোগ বিদ্যায় যিনি সর্বাধিক কৌশল প্রয়োগ করেছেন কুরুক্ষেত্র নামক ধর্মক্ষেত্রে।

যেখানে স্বয়ং ধর্ম অবতীর্ণ হয়ে যেনো পুরো বিশ্বচরাচরের ধর্ম এবং অধর্মকে দুই ভাগে দুই টুকরো করেছেন।
আজকাল পৃথিবীতে যেমন মসির থেকে অসিকে নিয়ে যুদ্ধ নামক রণক্ষেত্রে ঝাপিয়ে পড়ার আভাস পাওয়া যায় ঠিক পাঁচ হাজার বছর আগে রণক্ষেত্র বিজয়ী এক বীর -স্বয়ং যুদ্ধে অবতীর্ণ না হয়ে, পুরো বিশ্বকে অবাক করে এক সারথী হয়ে, এই জাতিকে শিখিয়ে গিয়েছেন অসির চেয়ে মসি বড়।

তাই গান্ডীবধারী বীর অর্জুনকে গীতায় ভগবান বলেছেন -

অপি চেদসি পাপেভ্যঃ সর্বেভ্যঃ পাপকৃত্তমঃ ।
সর্বং জ্ঞানপ্লবেনৈব বৃজিনং সন্তরিষ্যসি॥
ন হি জ্ঞানেন সদৃশং পবিত্রমিহ বিদ্যতে ।
তৎ স্বয়ং যোগসংসিদ্ধঃ কালেনাত্মনি বিন্দতি॥
(শ্রীমদ্ভগবদ্গীতা ৪/৩৬, ৩৮)

-তুমি যদি সমস্ত পাপীদের থেকেও পাপিষ্ঠ বলে গণ্য হয়ে থাক, তা হলেও এই জ্ঞানরূপ তরণীতে আরোহণ করে তুমি দুঃখ- সমুদ্র পার হতে পারবে।
ইহলোকে জ্ঞানের ন্যায় পবিত্র আর কিছু নাই। কর্ম্ম-যোগে সিদ্ধ-পুরুষ সেই জ্ঞান কালসহকারে আপনিই অন্তরে লাভ করে।

Even if you are considered to be the most sinful of all sinners, when you are situated in the boat of transcendental knowledge you will be able to cross over the ocean of miseries.
In this world, there is nothing so sublime and pure as transcendental knowledge. Such knowledge is the

mature fruit of all mysticism. And one who has become accomplished in the practice of devotional service enjoys this knowledge within himself in due course of time.

(Shreemadbhagavad Gita 4/36, 38)

যার জ্ঞান প্রজ্ঞায় বিপক্ষ দলীয় তৎকালীন বিশ্বের শক্তিধর তাবর তাবর মহারথীগন মাটিতে লুটিয়ে পড়েছেন। ধর্মকে যিনি স্বয়ং ধারন করে ছিলেন। ঠিক সেই দিন কুরুক্ষেত্রে ধর্ম প্রতিষ্ঠায় অধর্মীদের বিরুদ্ধে খেলায় মেতেছিলেন ত্রিলোক জয়ী এই মহান যোগেশ্বর। তাই বিপক্ষ শিবিরের শ্রেষ্ঠ যোদ্ধা কৌরব যুবরাজ দুর্যোধন যাকে হারানোর মূখ্য কর্ণধার ছিলেন যোগেশ্বর শ্রীকৃষ্ণ তবুও শ্রীকৃষ্ণের প্রতি দুর্যোধনের সম্মান ছিলো

স হি পূজ্যোতমো লোকে কৃষ্ণঃ পৃথুললোচনঃ।
ত্রয়াণামপি লোকানং বিদিতং মম সর্বথা।।
(মহাঃ উদ্যোগ ৮৯।৫)

হে বিদুরজী! বিশাল নেত্রযুক্ত শ্রীকৃষ্ণ এই লোকেই নয় বরং ত্রিলোকে সর্বশ্রেষ্ঠ হওয়ার কারণে পরম পূজনীয় পুরুষ, এই কথা আমার ভালোভাবে জ্ঞাত।

এই বিরাট পুরুষ কুরুক্ষেত্রে মোহাচ্ছন্ন অর্জুনকে বিশ্বরুপ বিজ্ঞান সমন্ধে আত্মোপলব্ধি করিয়েছেন। যখন যোগী যোগবিদ্যায় অত্যন্ত পারদর্শী এবং মুক্ত আত্মা তখন ব্রহ্মস্থিত অবস্থায় এই বিশ্বব্রহ্মাণ্ড জ্ঞানের রহস্য উন্মোচন করতে পারেন। যা অর্জুন পরম ঐশ্বর্যশালী মুক্ত আত্মা শ্রীকৃষ্ণের কৃপায় প্রত্যক্ষ করতে পেরেছিলেন -

এবমেতদ্ যথাখ ত্বমাত্মনং পরমেশ্বর।
দ্রষ্টুমিচ্ছামি তে রূপমৈশ্বরং পুরুষোত্তম।।
(গীতা ১১/৩)

অনুবাদঃ হে পরমেশ্বর! তোমার সম্বন্ধে যেরুপ বলেছ, যদিও আমার সম্মুখে তোমাকে সেই রূপেই দেখতে পাচ্ছি, তবুও হে পুরুষোত্তম! তুমি যেভাবে এই বিশ্বে প্রবেশ করেছ, আমি তোমার সেই ঐশ্বর্যময় রূপ দেখতে ইচ্ছা করি।

পশ্য যে পার্থ রূপাণি শতশোহথ সহস্রশঃ।
নানাবিধানি দিব্যানি নানাবর্ণাকৃতীনি চ।।
(গীতা-১১/৫)

অনুবাদঃ হে পার্থ! নানা বর্ণ ও নানা আকৃতি-বিশিষ্ট শত শত ও সহস্র সহস্র আমার বিভিন্ন দিব্য রূপসমূহ দর্শন কর।

ইহৈকস্থং জগৎ কৃৎস্নং পশ্যাদ্য সচরাচরম্।
মম দেহে গুড়াকেশ যচ্চান্যদ্ দ্রষ্টুমিচ্ছসি।।
(গীতা ১১/৭)

অনুবাদঃ হে অর্জুন! আমার এই বিরাট শরীরে একত্রে অবস্থিত সমগ্র স্থাবর-জঙ্গমাত্মক বিশ্ব এবং অন্য যা কিছু দেখতে ইচ্ছা কর, তা এক্ষণে দর্শন করা

এবমুক্ত্বা ততো রাজন্ মহাযোগেশ্বরো হরিঃ
দর্শয়ামাস পার্থায় পরমং রয়পমৈশ্বরম্।।
(গীতা-১১/৯)

অনুবাদঃ সঞ্জয় বললেন- হে রাজন! এভাবেই বলে, মহান যোগেশ্বর ভগবান শ্রীকৃষ্ণ অর্জুনকে তাঁর বিশ্বরূপ দেখালেন।

অনেকবজ্রনয়নমনেকাদ্ভুতর্শনম্।
অনেকদিব্যাভরণং দিব্যানেকোদ্যতায়ুধম্।।
দিব্যমাল্যাম্বরধরং দিব্যগন্ধানুলেপনম্।
সর্বাশ্চর্যময়ং দেবমনন্তং বিশ্বতোমুখম্।।
(গীতা ১১/১০-১১)

অনুবাদঃ অর্জুন সেই বিশ্বরূপে অনেক মুখ, অনেক নেত্র ও অনেক অদ্ভুত দর্শনীয় বস্তু দেখলেন। সেই রূপ অসংখ্য দিব্য অলঙ্কারে

সজ্জিত ছিল এবং অনেক উদ্যত দিব্য অস্ত্র ধারণ করেছিল। সেই বিশ্বরূপ দিব্য মালা ও দিব্য বস্ত্রে ভূষিত ছিল এবং তাঁর শরীর দিব্য গন্ধ দ্বারা অনুলিপ্ত ছিল। সবই ছিল অত্যন্ত আশ্চর্যজনক, জ্যোতির্ময়, অনন্ত ও সর্বব্যাপী।

দিবি সূর্যসহস্রস্য ভবেদ্যুগপদুত্থিতা ।
যদি ভাঃ সদৃশী সা স্যাদ্ ভাসস্তস্য মহাত্মনঃ।।
(গীতা ১১/১২)

অনুবাদঃ যদি আকাশে সহস্র সূর্যের প্রভা যুগপৎ উদিত হয়, তা হলে সেই মহাত্মা বিশ্বরূপের প্রভার কিঞ্চিৎ তুল্য হতে পারে।

ঠিক একইভাবে উপনিষদে ঋষি সনৎকুমার নারদ কে অন্ধকারের ওপারের জ্যোতির্ময় জ্ঞান প্রদর্শন করেছিলেন

তদেষ শ্লোকোন পশ্যো মৃত্যুং পশ্যতি ন রোগং নোড দুঃখতাং সর্বং পশ্যঃ পশ্যতি সর্বমাপ্নোতি সর্বশ ইতি।
স একধা ভবতি ত্রিধা ভবতি পঞ্চধা সপ্তধা নবধা চৈব পুনশ্চৈকাদশঃ মৃতঃ শতং চ দশ ডা সহস্রাণি চ বিংশতির।
(ছান্দগ্য উপনিষদ-৭/২৬/২)

তত্ত্বদর্শী মৃত্যুদর্শন করেন না, রোগ দর্শন করেন না। তত্ত্বদর্শী সবই দর্শন করেন, এবং সর্বদা সবই লাভ করেন। সৃষ্টির পূর্বে এক, তারপরে তিন, পাঁচ, সাত, নয় প্রকার হন, আবার তিনি একাদশ, একশত দশ এবং এক হাজার বিশ প্রকার হোন।
উপনিষদ এবং গীতার এই শ্লোক একজন মুক্ত আত্মার বহুমুখী প্রতিভার সাক্ষী। যাকে জ্ঞানীর দৃষ্টিতে বিশ্বরূপ দর্শন যোগ বলা হয়।

পরিশেষে, শ্রীকৃষ্ণ সম্বন্ধে মহাভারতের একটি শ্রেষ্ঠ উক্তি দিয়ে-

বেদ, বেদাঙ্গ, বিজ্ঞান এবং বল আদি সকল গুণ শ্রীকৃষ্ণের মধ্যে বিদ্যমান। এই জগতে কেশব ছাড়া, আর অধিক গুণসম্পন্ন কে আছে?
-মহাভারত, সভাপর্ব-৩৮/১৯
দ্বারকাধীশ, কালশ্রেষ্ঠ রাজনীতিবিদ, যুগশ্রেষ্ঠ বীর, ধর্মচ্ছত্রধারী, আর্যশ্রেষ্ঠ, যোগেশ্বর, ভগবান শ্রীকৃষ্ণের জন্মতিথিতে সকলকে জানাই শ্রীকৃষ্ণ জন্মাষ্টমীর শুভেচ্ছা।

জয় শ্রীকৃষ্ণ
শুভ জন্মাষ্টমী

আর্যশ্রেষ্ঠ শ্রীকৃষ্ণ -রাজনীতি ও যুদ্ধনীতি

(কংস, কালযবন ও জরাসন্ধ বধ প্রসঙ্গ)

শ্রী সৌরভ নন্দী

শুরুতেই ভক্তিযুক্ত চিত্তে স্বরণ করছি সেই পরম পুরুষোত্তম যোগেশ্বর ভগবান শ্রীকৃষ্ণকে যার আজীবন লক্ষ্য ছিল খণ্ড খণ্ড ভারতবর্ষকে অখণ্ড এক ধর্মরাজ্যে পরিণত করা, প্রকৃত রামরাজ্য তৈরি করা!

যদি আপনাকে বলা হয় গীতার একটা শ্লোক পাঠ করুন তো, তৎক্ষণাৎ আপনি হয়ত পাঠ করবেন-

যদা যদা হি ধর্মস্য গ্লানির্ভবতি ভারত ।
অভ্যুত্থানমধর্মস্য তদাত্মানং সৃজাম্যহম্ ॥ ৪-৭॥
পরিত্রাণায় সাধূনাং বিনাশায় চ দুষ্কৃতাম্ ।
ধর্মসংস্থাপনার্থায় সম্ভবামি যুগে যুগে ॥ ৪-৮॥

অর্থাৎ, যে যে সময়ে ধর্ম্মের বিপ্লব (বিরুদ্ধভাবের উদ্ভব) ও অধর্ম্মের প্রাদুর্ভাব হয়, সেই সেই সময়ে আমি আত্মাকে সৃষ্টি করিয়া থাকি। আমি সাধুগণের পরিত্রাণ, অসাধুগণের বিনাশ ও ধর্ম্মের সংস্থাপনের নিমিত্ত যুগে-যুগে জন্মগ্রহণ করি।[১]

আপনি প্রশ্ন করতেই পারেন, গীতার এত এত শ্লোক থাকতে আপনাকে দিয়ে কেন এই শ্লোকটাকেই পাঠ করালাম?
উত্তরটা এভাবে দেয়া যেতে পারে, একটা বিখ্যাত উক্তি রয়েছে স্বামী বিবেকানন্দের, “গীতা না পড়িলে কৃষ্ণচরিত্র বোঝা যাইতে পারে না কারণ তিনি তার নিজ উপদেশের মূর্তিমান বিগ্রহ ছিলেন” [২] উক্তিটি যেকারো বিচারেই যথার্থ।

সুতরাং আমরা যদি শ্রীকৃষ্ণের যুদ্ধনীতিকে উপলব্ধি করতে চাই তাহলেও আমাদের সেই শ্রীমদ্ভগবদগীতাতেই ফিরে যেতে হবে! উপরে বর্ণিত গীতার শ্লোকদুটোই যেন তার সাক্ষাৎ যুদ্ধনীতি।

এবার আমরা কংস, কালযবন ও জরাসন্ধ বধ প্রসঙ্গ বিশ্লেষণের মাধ্যমে তার রাজনীতি ও যুদ্ধনীতি বোঝার চেষ্টা করব। এক্ষেত্রে আমরা মহাভারত, হরিবংশের পাশাপাশি কিছু ক্ষেত্রে ভাগবত পুরাণেরও সাহায্য নেব!

চলুন তবে গুরুগম্ভীর আলোচনা ছেড়ে কিছুক্ষণ গল্প করি-
আচ্ছা আপনারা নিশ্চয়ই প্রতিবছর জন্মাষ্টমীর রাতে টিভি সিরিয়ালে নাদুস-নুদুস, গোফ ওয়ালা, মোটা ভুড়িওয়ালা, আমাদের সবার প্রিয় সেই কংস মামাকে চেনেন! এই মামাকে দিয়েই আমাদের গল্পের শুরু।

এই কংস মামার অত্যাচারী শাষণ ব্যাবস্থার কথা আর নাই বা বলি, ও নিয়ে অন্য কোন দিন বলা যাবে! যদি তার শাষণ ব্যাবস্থার কথা এক লাইনে বলে দেয়া যায় তবে বলতে হয়, “চারদিকে

তখন শুধু মার-মার, কাট-কাট অবস্থা, এর সাথে প্রজাদের চোখের জল আর দীর্ঘশ্বাস তো ছিলই। যে শুধুমাত্র নিজেকে রক্ষার জন্য পুরো এক এলাকার নব্যপ্রসূত সব শিশুকে হত্যার আদেশ দিতে পারে; যে নিজের পিতাকে বন্দি করে রাজসিংহাসন দখল করতে পারে, তার শাষণ ব্যাবস্থা কতটুকু ভালো বা খারাপ তা আর নতুন করে কি বলব?

যাইহোক, কালের নিয়মে কংস মামা শ্রীকৃষ্ণের হাতে নিহত হলেন। শ্রীকৃষ্ণ এরপর নিজে রাজত্ব গ্রহণ না করে কংসের বাবা উগ্রসেনকে মথুরার সিংহাসনে বসালেন।

এসময় কংসের পিতা উগ্রসেন কৃষ্ণকে অনুরোধ করেছিলেন যেন তিনি এই মথুরার রাজসিংহাসনে আরোহন করেন[৩]

কিন্তু এখানে কৃষ্ণ তার প্রস্তাব প্রত্যাখ্যান করে স্পষ্ট বললেন,"আমার রাজ্যের প্রয়োজন নাই, আমার সে আকাঙ্খাও নহে । আর আমি রাজ্যের লোভে কংসকে নাশও করি নাই। কেবল লোকের হিতসাধন করত ও যশোপার্জনের জন্য এই কুলের উপহাসস্বরূপ আপনার পুত্রকে তাহার অনুচরবর্গের সহিত সংহার করিয়াছি। আমি স্বেচ্ছাচারী গজের ন্যায়, গোপমধ্যে সেই বনচর গোপ হইয়াই আনন্দে বিচরণ করিব। আমি শতবার সত্য করিয়া এই কথা বলিতেছি যে আমার রাজা হইবার প্রয়োজন নাই। আপনি এই কথা প্রচার করুন; আপনি আমার মান্য ও যদুবংশের নায়ক ; আপনিই রাজা হউন; রাজ সিংহাসনে অভিষিক্ত হউন; আপনার জয় হউক। যদি আমার অভিষ্ঠ সাধন করিতে আপনার ইচ্ছা থাকে, যদি আপনার ব্যাথা না জন্মে তাহা হইলে, আমি আপনার রাজ্য পরিত্যাগ করিতেছি আপনি আপনার নিজের সেই রাজ্য চিরকালের জন্য গ্রহণ করুন!"[৪]

এখানে বঙ্কিমচন্দ্র স্পষ্ট করেই শ্রীকৃষ্ণের যুদ্ধনীতি সম্পর্কে বলছেন,"এ দেশের চিরপ্রচলিত রীতি ও নীতি এই যে, যে রাজাকে বধ করিতে পারে, সেই তাহার রাজ্যভোগী হয়। কংসের বিজেতা কৃষ্ণ অনায়াসেই মথুরার সিংহাসন অধিকৃত করিতে পারিতেন; কিন্তু তিনি তাহা করিলেন না, কেন না, ধর্মতঃ সে রাজ্য উগ্রসেনের। উগ্রসেনকে পদচ্যুত করিয়াই কংস রাজা হইয়াছিল। ধর্মই কৃষ্ণের নিকট প্রধান, তিনি শৈশবাবধিই ধর্মাত্মা। অতএব যাহার রাজ্য, তাহাকেই তিনি রাজ্য প্রধান করিলেন। আমরা পরে দেখিব যে, তিনি প্রকাশ্যে বলিতেছেন যে, যাহাতে পরহিত, তাহাই ধর্ম। এখানে ঘোরতর অত্যাচারী কংসের বধে সমস্ত যাদবগণের হিতসাধন হয়, এইজন্য তিনি কংসকে বধ করিয়াছিলেন—ধর্মার্থ মাত্র। বধ করিয়া করুণহৃদয় আদর্শপুরুষ কংসের জন্য বিলাপ করিয়া ছিলেন, এমন কথা গ্রন্থে(হরিবংশ) লিখিত আছে। এই কংসবধে আমরা প্রথমে প্রকৃত ইতিহাসের সাক্ষাৎ পাই এবং এই কংসবধেই দেখি যে, কৃষ্ণ পরম বলশালী, পরম কার্যদক্ষ, পরম ন্যায়পরায়ণ, পরম ধর্মাত্মা, পরহিতে রত, এবং পরের জন্য কাতর। এইখান হইতে দেখিতে পাই যে, তিনি আদর্শ মানুষ।"[৫]

আজ যেখানে মানুষ শুধু ভোগের চেষ্টায় ব্যাস্ত, সেখানে রাজ্যলাভের সুযোগ পেয়েও তা প্রত্যাখ্যান করে শুধুমাত্র কংসকে বধ করে অধর্মকে নাশ করার পর যার রাজ্য তাকে ফিরিয়ে দেয়ার মতো মহান রাজনৈতিক প্রজ্ঞা শ্রীকৃষ্ণ ভিন্ন আর কারই বা থাকতে পারে?

এই প্রজ্ঞা থেকেই আমরা গীতায় তাকে বলতে শুনি-

কর্মণ্যেবাধিকারস্তে মা ফলেষু কদাচন ।
মা কর্মফলহেতুর্ভূর্মা তে সঙ্গোঽস্ত্বকর্মণি ॥

অর্থাৎ, কর্ম্মেই তোমার অধিকার হউক, কর্ম্মফলে যেন কামনা না হয়; কর্ম্মফল যেন তোমার প্রবৃত্তির হেতু না হয় এবং কর্মপরিত্যাগে তোমার আসক্তি না হউক।[৬]

যাইহোক কংসের মৃত্যুর পর শ্রীকৃষ্ণ বেশ অনেক দিন ধরে মথুরায় শান্তিতেই ছিলেন। [মাঝের সময়ের ঘটনা একটু পরে জানাব]

অন্যদিকে ইন্দ্রপ্রস্থে যুধিষ্ঠির নারদের মুখে শুনে রাজসূয় যজ্ঞ করার চিন্তা করলেন। কিন্ত এ ব্যাপারে কারো সিদ্ধান্তই তার কাছে মনোঃপুত হলো না। তাই তিনি তার পরম মিত্র ও নীতিজ্ঞ শ্রীকৃষ্ণকে ডেকে এনে তার কাছে সিদ্ধান্ত জানতে চাইলেন।
পাণ্ডবরা চিরকালই শ্রীকৃষ্ণকে পরম আশ্রয় মেনে এসেছেন। তারই প্রতিফল হিসেবে আমরা গীতায় অর্জুনের মুখে শুনি-

কার্পণ্যদোষোপহতস্বভাবঃ
পৃচ্ছামি ত্বাং ধর্মসম্মূঢ়চেতাঃ ।
যচ্ছ্রেয়ঃ স্যান্নিশ্চিতং ব্রূহি তন্মে
শিষ্যস্তেঽহং শাধি মাং ত্বাং প্রপন্নং ॥
(শ্রীমদ্ভগবদগীতা ২-৭)

এই এক শ্লোকই যেন শ্রীকৃষ্ণকে গীতার মতো এক মহান গ্রন্থ জগতে প্রকট করতে প্রেরণা দেয়।

শ্রীকৃষ্ণের সাথে পাণ্ডবদের গভীর প্রণয় আমরা দেখি দ্রৌপদীর স্বয়ংবর সভায়। কৃষ্ণ যে ততদিনে আর্যাবর্তের রাজনীতিতে যে একজন পোড় খাওয়া মান্য ব্যাক্তিত্ব হিসেবে আত্মপ্রকাশ করে ফেলেছেন তার প্রমাণ আমরা তার প্রতি দ্রুপদ পরিবারের আস্থা, স্বয়ংবর সভার নিমন্ত্রণ পাওয়া, যুদ্ধে উদ্যত ক্ষত্রিয়কুলকে নিবৃত্ত করা থেকেই পাই।

যাইহোক, এবার কৃষ্ণ যুধিষ্ঠিরকে বললেন,"হে মহারাজ! তুমি সর্ব্বগুণে গুণবান, অতএব রাজসূয় যজ্ঞ করা তোমার পক্ষে অবিধেয় নহে। তুমি সর্ব্বথা রাজসূয়ানুষ্ঠানের উপযুক্ত পাত্র, সন্দেহ নাই।"[৭]
কিন্তু সাথে সাথে এও মনে করিয়ে দিলেন, সেই যজ্ঞ করার পথ তার জন্য খুবই কণ্টকাকীর্ণ। এখন কেন কণ্টকাকীর্ণ তা বুঝতে হলে প্রথমেই আমাদের বুঝতে হবে রাজসূয় যজ্ঞ কি-

রাজসূয় যজ্ঞ হল, রাজার রাজ্য অভিষেকের সময় বিরাট যজ্ঞের অনুষ্ঠান বিশেষ । এই যজ্ঞ রাজকীয় এবং রাজনৈতিক অনুষ্ঠান। এর প্রধান অর্থ হচ্ছে যিনি এই যজ্ঞ অনুষ্ঠান করবেন, তিনি সার্বভৌম রাজা হবেন। অন্যান্য রাজারা তার বশ্যতা স্বীকার করবেন । এই যজ্ঞ কেবল রাজাদেরই করার অধিকার। রাজারা এই যজ্ঞ করে সম্রাট উপাধি লাভ করতেন।

সুতরাং রাজসূয় যজ্ঞ করতে হলে রাজাকে অবশ্যই পুরো সাম্রাজ্য থেকে স্বীকৃতি আদায় করতে হবে। কিন্তু এখানেই হলো মূল সমস্যা। কেননা তখন আর্যাবর্তে অঘোষিত সম্রাটের আসনে বসেছিলেন জরাসন্ধ।

এই প্রসঙ্গে শ্রীকৃষ্ণ বলছেন- "হে ভরতসত্তম! তুমি সম্রাটতুল্য গুণশালী, অতএব তোমার সম্রাট হওয়া নিতান্ত আবশ্যক; কিন্তু আমারই নিশ্চয় বোধ হইতেছে, জরাসন্ধ জীবিত থাকিতে তুমি কখনই রাজসূয় যজ্ঞানুষ্ঠানে কৃতকার্য্য হতে পারিবে না। সে বাহুবলে সমস্ত ভূপতিগণকে পরাজয় করিয়া সিংহ যেমন পর্ব্বত কন্দরমধ্যে করিগণকে বদ্ধ রাখে, সেইরূপ তাহাদিগকে গিরিদুর্গে বদ্ধ করিয়া রাখিয়াছে । ঐ দুরাত্মা রাজসূয় যজ্ঞার্থ প্রতিজ্ঞা করিয়া কঠোর তপোনুষ্ঠান দ্বারা দেবাদিদেব মহাদেবকে প্রসন্ন করিয়াছিল। পরে সমস্ত ভূপতিগণকে পরাজয় করিয়া আপনার প্রতিজ্ঞা পরিপূর্ণ করিল। সে ক্রমে ক্রমে সমস্ত ভূপালগণকে পরাজয় করত আপনার পুরে আনয়নপূর্ব্বক বদ্ধ করিয়া রাখি য়াছে। আমরা জরাসন্ধের ভয়ে ভীত হইয়া মথুরা পরিত্যাগপূর্ব্বক দ্বারাবতী নগরীতে পলায়ন করিয়াছি । হে মহারাজ! যদি তোমার রাজসূয় যজ্ঞ করিবার মানস থাকে, তবে অগ্রে জরাসন্ধ কর্তৃক বদ্ধ ভূপালগণের মোচন ও দুরাত্ম! জরাসন্ধের বধের নিমিত্ত যত্ন কর; নচেৎ তুমি কোন ক্রমেই রাজসূয় যজ্ঞ সুসম্পন্ন করিতে

পারিবে না । কুরুনন্দন! আমার এই মত, এক্ষণে তুমি আপনি বিবেচনা করিয়া যাহা উচিত হয় বল।"[৮]

এখন কে এই জরাসন্ধ?

মগধ রাজ্যের অধিপতি বৃহদ্রৎ নামক এক রাজার পুত্র হলো জরাসন্ধ যিনি তার পিতার পর রাজসিংহাসন লাভ করেন। এরপর শুরু হয় তার ত্রাসের রাজত্ব। তার নমুনা হিসেবে আমরা দেখেছি তিনি ৮৬জন রাজাকে বন্দি করে রাখেন নরবলি দেয়ার জন্য। এরপর ত্রয়োদশ অধ্যায়েই আবার দেখি তিনি আর্যাবর্তের প্রায় সব শক্তিশালী রাজাকেই বশীভুত করে নিজের সেবায় লাগিয়েছেন আর বাকি রাজারা তার ভয়ে পালিয়ে বেরাচ্ছে। সবচেয়ে বড় ব্যাপার হলো তার সৈন্যের সংখ্যা প্রায় ২০ অক্ষৌহিনী যা কিনা কুরুক্ষেত্রের মোট সৈন্যের চেয়েও দুই অক্ষৌহিনী বেশি। তাহলে এখানে স্পষ্ট এই জরাসন্ধকে যিনি বধ করতে পারবেন সম্রাটের আসনে তিনিই বসবেন, এতে করে একইসাথে পুরো আর্যাবর্তের নিয়ন্ত্রণও তার হাতে আসবে।

এবার আমাদের আবার একটু গুরুগম্ভীর আলোচনায় যেতে হবে। এখানে শ্রীকৃষ্ণের রাজনৈতিক প্রজ্ঞা কি? কেনই বা তিনি যুধিষ্ঠিরকে জরাসন্ধের স্থলাভিষিক্ত করতে চেয়েছিলেন?

শ্রীকৃষ্ণের সময়ে ভারত ছিল খণ্ড-বিখণ্ড তাই পরস্পরের মধ্যে যুদ্ধ ছিল নিত্যনৈমিত্তিক ঘটনা। নিশ্চিতভাবেই বহিঃশক্তির আক্রমণ আটকানোর জন্য এই পরিস্থিতি একেবারেই প্রতিকুল। তাই কৃষ্ণ চাচ্ছিলেন পুরো ভারতবর্ষকে এক ধর্মরাজ্যের পতাকাতলে নিয়ে আসতে যেখানে প্রত্যেক রাজা তার রাজ্যকে নিয়ন্ত্রন করবে কিন্তু তারা একটা ঐক্য বিদ্যমান রাখবে এক কেন্দ্রীয় নিয়ন্ত্রকের অধীনে।
তখন রাজাদের মধ্যে ঐক্য না থাকলেও সেরকম কেন্দ্রীয় নিয়ন্ত্রণ ছিল জরাসন্ধের হাতে সুতরাং তাকে সরিয়ে দিয়ে অন্য কাউকে আনতে পারলেই কৃষ্ণের উদ্দেশ্য পুরণ হয়। এই চিন্তা করে তিনি যুধিষ্ঠিরকে সেখানে নিয়ে আসতে চাইলেন কেননা যুধিষ্ঠির ও তার মিত্র সবাই তৎকালীন সময়ের শ্রেষ্ট ধর্মজ্ঞ ও বীর। সুতরাং তাদের নিয়ন্ত্রনেই প্রকৃত ধর্মরাষ্ট্র বাস্তবায়ন সম্ভব। তাহলে এখানে কৃষ্ণের রাজনৈতিক প্রজ্ঞা বোঝা গেল।

এবার আমরা দেখব জরাসন্ধকে বধ করার জন্য কৃষ্ণ কোন পন্থা অবলম্বন করেছিলেন।
মহাভারতে আমরা পাই- "বৈশম্পায়ন কহিলেন, বিপুলতেজা বাসুদেব যুধিষ্ঠিরের এই বাক্য শ্রবণানন্তর ভীমার্জুন সমভিব্যাহারে তেজস্বী স্নাতক ব্রাহ্মণগণের পরিচ্ছদ পরিধানপূর্ব্বক মগধদেশে যাত্রা করিলেন। সুহৃদগণ মনোহর বাক্য দ্বারা তাহাদিগকে অভিনন্দন করিতে লাগিলেন।" [৯]

এখন প্রশ্ন হতে পারে কেন তারা সৈন্য সামন্ত নিয়ে সামনাসামনি যুদ্ধে না গিয়ে ছদ্মবেশে সেখানে গেলেন ও জরাসন্ধকে বধ করলেন!

উত্তর হলো, এটাই শ্রীকৃষ্ণের যুদ্ধনীতি ছিল! প্রথমেই বলেছিলাম জরাসন্ধের সৈন্যবাহিনীর বিপুলতার কথা! এখানে যদি শ্রীকৃষ্ণ সরাসরি যুদ্ধে প্রবৃত্ত হতেন তাতে উভয়পক্ষেরই প্রচুর সৈন্য হতাহত হত! অনেক নিরাপরাধ নিহত হতেন সেক্ষেত্রে গীতা ৪/৭-৮ এই শ্লোকগুলোর তাৎপর্য রক্ষিত হত না। আবার এতে তার মহৎ উদ্দেশ্যও সিদ্ধ হওয়া কষ্টকর হতো। তাই তিনি জরাসন্ধের সভায় ছদ্মবেশে গিয়ে তার সাথে মল্লযুদ্ধের প্রস্তাব দেন। অর্থাৎ তার উদ্দেশ্য কোনরূপ ধ্বংসযজ্ঞ না চালিয়ে শুধু জরাসন্ধকে বধ করা।

জরাসন্ধও তার ছেলের রাজ্যাভিষেক করিয়ে তার প্রজা, পাত্র-মিত্র সবার উপস্থিতিতে ভীমের সাথে ১৪দিন ধরে মল্লযুদ্ধ করে নিহত হন। পরে কৃষ্ণ,ভীম ও অর্জুন জরাসন্ধের বন্দি ৮৬জন রাজাকে মুক্তি দিয়ে জরাসন্ধের ছেলে সহদেবকে সিংহাসনে বসিয়ে ইন্দ্রপ্রস্থে প্রস্থান করলেন।

এখানেও শ্রীকৃষ্ণ চাইলে রাজা হতে পারতেন, কিন্তু তিনি তা না করে ন্যায়পূর্বক পিতার রাজ্য পুত্রকে দিয়ে বিদায় হন।

এখানে তার যুদ্ধনীতি সম্পর্কে বঙ্কিমচন্দ্রের উক্তি উল্লেখ না করলেই নয়। বঙ্কিমবাবু বলছেন-
"আর ইহাও পশ্চাৎ দেখিব যে, সর্বভূতে দয়াময় কৃষ্ণ প্রাণিহত্যা পক্ষে ধর্ম প্রয়োজন ব্যতীত অনুরাগ প্রকাশ করেন না। যুদ্ধ অনেক সময়েই ধর্মানুমোদিত, সে সময়ে যুদ্ধে অপ্রবৃত্ত হইলে, ধর্মের হানি হয়, গীতায় কৃষ্ণ এই মতই প্রকাশ করিয়াছেন। এবং এখানেও কালযবন এবং জরাসন্ধের সহিত যুদ্ধ ধর্ম যুদ্ধ। আত্মরক্ষার্থে এবং স্বজনরক্ষার্থে, প্রজাগণের রক্ষার্থে যুদ্ধ না করা ঘোরতর অধর্ম। কিন্তু যদি যুদ্ধ করিতেই হইল, তবে যত অল্প মনুষ্যের প্রাণহানি করিয়া কার্য সম্পন্ন করা যায়, ধার্মিকের তাহাই কর্তব্য। আমরা মহাভারতের সভাপর্বে জরাসন্ধবধ-পর্বাধ্যায়ে দেখিব যে, যাহাতে অন্য কোন মনুষ্যের জীবন হানি না হইয়া জরাসন্ধবধ সম্পন্ন হয়, কৃষ্ণ তাহার সদুপায় উদ্ভূত করিয়াছিলেন। কালযবনের যুদ্ধেও তাহাই করিলেন।"

চলুন আবার গল্প করি-
জরাসন্ধের ঘটনা তো জানলাম এখন আমরা কালযবনের সাথে যুদ্ধে ঠিক কি হয়েছিল তা দিয়েই আজকের আলোচনা শেষ করব-

উপরে বলেছিলাম জরাসন্ধ মথুরা আক্রমণ করেছিলেন। এখন কতবার আক্রমণ করেছিলেন তা নিয়ে বিস্তারিত আলোচনা করা দরকার কেননা এই অংশে বিতর্ক আছে।যাইহোক অন্তত একবার আক্রমণ যে করেছিলেন বা করার জন্য উদ্যত হয়েছিলেন তা মহাভারতেই পাই আমরা। আগ্রহী পাঠক তা সভাপর্বের ত্রয়োদশ অধ্যায় থেকে দেখে নিবেন।

কালযবনের ইতিহাস আমরা মহাভারতে পাইনা পাই ভাগবত ও হরিবংশে। এখানে ঘটনাকে ছোট করে তার সারসংক্ষেপ বললে দাড়ায়-
কালযবন তখন ভারতবর্ষে বেশ প্রতাপশালী এক রাজা। তিনি জরাসন্ধের সাথে মিলে মথুরা আক্রমণ করতে উদ্যত হয়েছেন। এ যেন মরার উপরে খাড়ার ঘা!

এখানে শ্রীকৃষ্ণের যুদ্ধনীতিকে ভাগবতের কয়েকটা শ্লোক দ্বারা বোঝানো যেতে পারে! ভাগবতের ১০/৫০/৪৪-৪৮ ও ৫৭ শ্লোকের অনুবাদ নিম্নরুপ-

...সুতরাং কালযবনও নারদের উপদেশ অনুসারে তিন কোটি ম্লেচ্ছ সৈন্য সঙ্গে লইয়া তথায় আগমন করিলেন এবং মথুরাকে অবরুদ্ধ করিলেন। ৪৪

তাদৃশ সৈন্য-সামন্তে পরিবৃত যবনাধিপতিকে যুদ্ধার্থ উপস্থিত হইতে অবলোকন করিয়া শ্রীকৃষ্ণ বলরামের সহিত একত্রে চিন্তা করিয়া বলিলেন,— অহো! যাদবগণের বিষম বিপদ উপস্থিত বলিয়া আমি বিশেষ অনুভব করিতেছি।৪৫

এদিকে মহাবল কালযবন অদ্য আমাদিগের মথুরার দ্বার অবরোধ করত অবস্থান করিতেছে, ওদিকে অদ্য বা কল্য বা আগামী পরশ্ব জরাসন্ধ যুদ্ধার্থ আগমন করিবে।৪৬

আমরা উভয়ে ইহার সহিত সংগ্রামে নিযুক্ত থাকিবার সময় যদি জরাপুত্র মগধ হইতে আসিয়া উপস্থিত হয়, তাহা হইলে বিলক্ষণ বিপদেরই সম্ভাবনা সেই মহাবল পরাক্রান্ত জরাসন্ধ আমাদিগের যাবতীয় বন্ধুবর্গকে হয় নিধন করিবে, নতুবা বন্দী করত তাহার স্বীয় রাজ্য মগধেই লইয়া যাইবে।৪৭

অতএব এরূপ অবস্থায় এমন একটি দুর্গ নির্মাণ করা প্রয়োজন, যেস্থানে মনুষ্যের গতিবিধি হইতে না পারে এবং সেই দুর্গে জ্ঞাতিগণকে রাখিয়া আসিয়া কালযবনকে নিহত করিব। ৪৮

ভগবান শ্রীকৃষ্ণ অগ্রজ বলদেবের সহিত এইরূপ পরামর্শ করিয়া সমুদ্র মধ্যে এক অদ্ভুত দুর্গ প্রস্তুত করিলেন এবং দুর্গমধ্যে দ্বাদশ যোজন বিস্তীর্ণ এক অপূর্ব্ব মনোরম নগর বিশ্বকর্মার দ্বারা নির্মাণ করাইলেন।৪৯

[খুব সম্ভবত দ্বারকা নগরী তখন নির্মান হয়ে গিয়েছে কেননা ৫৭ শ্লোকে আমরা পাই কৃষ্ণ সেখানে মথুরাবাসীদের রেখে এসে যুদ্ধে প্রবৃত্ত হচ্ছেন]

ভগবান শ্রীকৃষ্ণ স্বকীয় অচিন্ত্যশক্তি যোগমায়ার প্রভাবে সকলের অজ্ঞাতসারে জনগণকে মথুরা হইতে সেই দুর্গে লইয়া গেলেন এবং তৎপরে মথুরায় প্রত্যাগমন পূর্ব্বক বলরামের সহিত পরামর্শ করিয়া একাকী গলদেশে পদ্মমালা ধারণকরত বিনা অস্ত্রে মথুরার দ্বার দিয়া নির্গত হইলেন।৫৭ [১০]

এরপর ৫১ তম অধ্যায়ে পাই-
শ্রীকৃষ্ণ বিনা অস্ত্রে কালযবনের শিবিরে গিয়ে তাকে ভুলিয়ে এক গিরিগুহায় নিয়ে আসেন। সেখানে তিনি স্বীয় বাহুবলে অথবা মুচুকুন্দ ঋষির মাধ্যমে বধ করেন।

এখানেও আমরা দেখতে পেলাম যে শ্রীকৃষ্ণ শুধু কালযবনকে হত্যার মাধ্যমেই পুরো একটা রক্তক্ষয়ী সংঘাতকে থামিয়ে দিলেন! এক্ষেত্রে তিনি যেমন নিজের পক্ষের সাধারণ লোক ও সৈন্যদের রক্ষা করলেন তেমনি কালযবনের সৈন্যদেরও রক্ষা করলেন। অর্থাৎ অত্যাচারী দমনও হলো আর শিষ্টের পালনও হলো। মাঝখানে কালযবনের সেনারাও রক্ষা পেল।

তাহলে কংস, জরাসন্ধ ও কালযবন বধসহ সব জায়গাতেই আমরা দেখি তিনি সর্বদা চেষ্টা করেছেন কিভাবে শুধু দুস্কৃতিকারীকেই বধ করে সমাজে শান্তি প্রতিষ্টা হয়। কোন নিরপরাধ যাতে না হতাহত হয়।

তাই আবারও বলতে পারি, এমন মহান যুদ্ধনীতি ও রাজনৈতিক প্রজ্ঞা এক আর্যশ্রেষ্ঠ শ্রীকৃষ্ণ বাদে আর কার আছে?

এখন একদল আমাকে জিজ্ঞাসা করতেই পারে এই রাজনৈতিক প্রজ্ঞা কেন কুরুক্ষেত্রের যুদ্ধে তিনি প্রয়োগ করেননি? এই প্রশ্নের উত্তর পুরো উদ্যোগ পর্ব জুড়েই বিদ্যমান। সেখানেও তিনি চেষ্টা করেছিলেন কিন্তু তার চেষ্টা তখন ব্যার্থ হয়েছিল। আগ্রহীরা পুরো উদ্যোগ পর্ব পড়ে দেখতে পারেন।

সে যাইহোক, শ্রীকৃষ্ণের এই আদর্শের প্রতিফলন আমরা দেখতে পাই অটক থেকে কটকে গৈরিক পতাকায় আকাশ ছেড়ে দেয়া ছত্রপতি শিবাজী মহারাজের মধ্যেও। আবার দুজনের লক্ষ্যও ছিল অভিন্ন। শ্রীকৃষ্ণের দেখানো এই চক্রবর্তী রাজ্যের স্বপ্ন দেখতেন আমাদের ভারতবর্ষের পিতামহ মহর্ষি দয়ানন্দ সরস্বতীও।

এভাবেই আমাদের পুর্বজরা শ্রীকৃষ্ণকে অনুসরণ করে আর্যাবর্তকে সংগঠিত করার প্রয়াস করেছেন কেননা একতাই শক্তি, একতাই বল, সংঘাতই পতনের কারণ। আজ পৃথিবীর এই রাজনৈতিক দুর্দিনের সমাধান হয়ত নিহিত আছে শ্রীকৃষ্ণের সেই যুদ্ধনীতি ও রাজনৈতিক প্রজ্ঞার মধ্যেই। তাই তো আমরা গর্ব করে বলতে পারি- তিনি আমাদের, আমাদের হৃদয়সম্রাট, আর্যশ্রেষ্ঠ শ্রীকৃষ্ণ।

শেষ করব শ্রীমদ্ভগবদগীতার আর একটা উক্তি দিয়ে-

যত্র যোগেশ্বরঃ কৃষ্ণো যত্র পার্থো ধনুর্ধরঃ ।
তত্র শ্রীর্বিজয়ো ভূতির্ধ্রুবা নীতির্মতির্মম ॥

অর্থাৎ, যে পক্ষে বাসুদেব ও অর্জ্জুন অবস্থান করিতেছেন, তাহাদিগেরই রাজ্যলক্ষ্মী, জয়, অভ্যুদয় ও নীতি লাভ হইবে।[১১]

সুতরাং দেশে শান্তি প্রতিষ্ঠার জন্য আমাদের দরকার শ্রীকৃষ্ণের মতো রাজনৈতিক কুশীলব আর অর্জুনের মতো সেনাপতি।

শ্রীবৎসাঙ্কং মহোরস্কং বনমালা বিরাজিতম।
শঙ্খচক্র ধরং দেবং কৃষ্ণং বন্দে জগদ্গুরুম॥ [১২]

জয় শ্রীকৃষ্ণ

তথ্যসূত্রঃ

----------~=~----------

[১] কালীপ্রসন্ন সিংহের অনুবাদ
[২] স্বামী বিবেকানন্দের বানী ও রচনা, পঞ্চম খণ্ড, ভারতীয় মহাপুরুষগণ নামক প্রবন্ধ
[৩] হরিবংশ, বিষ্ণুপর্ব, আচার্য পঞ্চানন তর্করত্নের সংস্করণ ৩১-৩২ অধ্যায়, প্রতাপ চন্দ্র রায়ের সংস্করণ ৮৮অধ্যায়
[৪] ঐ
[৫] কৃষ্ণচরিত্র, তৃতীয়খণ্ড, প্রথম পরিচ্ছেদ, কংসবধ
[৬] কালীপ্রসন্ন সিংহের অনুবাদ
[৭] মহাভারত, সভাপর্ব, ১৩ তম অধ্যায়, কালীপ্রসন্ন সিংহের অনুবাদ
[৮] ঐ
[৯] মহাভারত, সভাপর্ব, ২৯ তম অধ্যায়, কালীপ্রসন্ন সিংহের অনুবাদ
[১০] আর্যশাস্ত্র প্রকাশিত পুস্তক
[১১] কালীপ্রসন্ন সিংহের অনুবাদ
[১২] শ্রীকৃষ্ণাষ্টকম

কৃষ্ণচরিত্রঃ কৃষ্ণের বহুবিবাহ

শ্রী বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়

কৃষ্ণ রুক্মিণীকে পূর্বে বিবাহ করিয়াছিলেন, এক্ষণে এক সম্যন্তক মণির প্রভাবে আর দুটি ভার্যা জাম্ববতী এবং সত্যভামা, লাভ করিলেন। ইহাই বিষ্ণুপুরাণ বলেন, হরিবংশ এক পৈঠা উপর গিয়া থাকেন,—তিনি বলেন, দুইটি না, চারিটি। সত্রাজিতের তিনটি কন্যা ছিল,—সত্যভামা, প্রস্বাপিনী এবং ব্রতিনী। তিনটিই তিনি শ্রীকৃষ্ণে অর্পণ করিলেন। কিন্তু দুই চারিটায় কিছু আসিয়া যায় না—মোট সংখ্যা নাকি ষোল হাজারের উপর। এইরূপ লোকপ্রবাদ।

বিষ্ণুপুরাণে ৪ অংশে আছে,

"ভগবতোহ'প্যত্রমর্ত্যলোকেহবতীর্ণ স্য ষোড়শসহস্রাণ্যেকোত্তরশতা—ধিকানি স্ত্রীণামভবন্।"

(বিষ্ণুপুরাণ, ৪ অং, ১৫ অ, ১৯)

কৃষ্ণের ষোল হাজার এক শত এক স্ত্রী।

কিন্তু ঐ পুরাণের ৫ অংশের ২৮ অধ্যায়ে প্রধানাদিগের নাম করিয়া পুরাণকার বলিতেছেন, রুক্মিণী ভিন্ন "অন্যাশ্চ ভার্যাঃ কৃষ্ণস্য বভূবুঃ সপ্ত শোভনাঃ।" তার পর, "ষোড়শাসন্ সহস্রাণি স্ত্রীণামন্যানি চক্রিণঃ।" তাহা হইলে, দাঁড়াইল ষোল হাজার সাত জন। ইহার মধ্যে ষোল হাজার নরককন্যা। সেই আষাঢ়ে গল্প বলিয়া আমি ইতিপূর্বেই বাদ দিয়াছি।

গল্পটা কত বড় আষাঢ়ে, আর এক রকম করিয়া বুঝাই। বিষ্ণুপুরাণের চতুর্থ অংশের ঐ পঞ্চদশ অধ্যায়ে আছে যে, এই সকল স্ত্রীর গর্ভে কৃষ্ণের এক লক্ষ আশী হাজার পুত্র জন্মে। বিষ্ণুপুরাণে কথিত হইয়াছে যে, কৃষ্ণ এক শত পঁচিশ বৎসর ভূতলে ছিলেন। হিসাব করিলে, কৃষ্ণের বৎসরে ১৪৪০টি পুত্র, ও প্রতিদিন চারিটি পুত্র জন্মিত। এ স্থলে এইরূপ কল্পনা করিতে হয় যে, কেবল কৃষ্ণের ইচ্ছায় কৃষ্ণমহিষীরা পুত্রবতী হইতেন। এই নরকাসুরের ষোল হাজার কন্যার আষাঢ়ে গল্প ছাড়িয়া দিই। কিন্তু তদ্ভিন্ন আট জন "প্রধানা" মহিষীর কথা পাওয়া যাইতেছে। এক জন রুক্মিণী।বিষ্ণুপুরাণকার বলিয়াছেন, আর সাত জন। কিন্তু ৫ অংশের ২৮ অধ্যায়ে নাম দিতেছেন আট জনের, যথা—

"কালিন্দী মিত্রবিন্দা চ সত্যা নাগ্নজিতী তথা।
দেবী জাম্ববতী চাপি রোহিণী কামরূপিণী॥
মদ্ররাজসুতা চান্যা সুশীলা শীলমণ্ডনা।
সাত্রাজিতী সত্যাভামা লক্ষ্মণা চারুহাসিনী॥"

১/কালিন্দী, ২/মিত্রবিন্দা, ৩/নগ্নজিৎকন্যা সত্যা, ৪/জাম্ববতী, ৫/রোহিণী (ইনি কামরূপিণী), ৬/মদ্ররাজসুতা সুশীলা, ৭/সত্রাজিতকন্যা সত্যভামা, ৮/লক্ষ্মণা

রুক্মিণী লইয়া নয় জন হইল। আবার ৩২ অধ্যায়ে আর এক প্রকার। কৃষ্ণের পুত্রগণের নামকীর্তন হইতেছে:—

প্রদ্যুম্নাদা হরেঃ পুত্রা রুক্মিণ্যাঃ কথিতাস্তব।
ভানুং ভৈমরিকঞ্চৈব সত্যাভামা ব্যজায়ত॥১॥
দীপ্তিমান্ তাম্রপক্ষাদ্যা রোহিণ্যাং তনয়া হরেঃ।
বভূবুর্জাম্বুবত্যাঞ্চ শাম্বাদ্যা বাহুশালিনঃ ॥২॥
তনয়া ভদ্রবিন্দাদ্যা নাগ্নজিত্যাং মহাবলাঃ।
সংগ্রামজিৎপ্রধানাস্তু শৈব্যায়াস্ত্বভবন্ সুতাঃ॥৩॥
বৃকদ্যাস্তু সুতা মাদ্র্যাং গাত্রবৎপ্রমুখান্ সুতান্।
অবাপ লক্ষ্মণা পুত্রাঃ কালিন্দ্যাঞ্চ শ্রুতাদয়ঃ॥৪॥

এই তালিকায় পাওয়া গেল, রুক্মিণী ছাড়া,

১/সত্যভামা (৭), ২/রোহিণী (৫), ৩/জাম্ববতী(৪) ৪/নাগ্নজিতী (৩), ৫/শৈব্যা (২), ৬/মাদ্রী (৬), ৭/লক্ষ্মণা (৮), ৮/কালিন্দী (১)

কিন্তু ৪র্থ অংশের ১৫ অধ্যায়ে আছে, "তাসাঞ্চ রুক্মিণী-সত্যভামাজাম্ববতী-জালহাসিনীপ্রমুখা অষ্টৌ পত্ন্যঃ প্রধানাঃ।" এখানে আবার সব নাম পাওয়া গেল না, নূতন নাম "জালহাসিনী" একটা পাওয়া গেল। এই গেল বিষ্ণুপুরাণে। হরিবংশে আরও গোলযোগ।

হরিবংশে আছে;—

মহিষীঃ সপ্ত কল্যাণীস্ততোহন্যা মধুসূদনঃ।
উপযেমে মহাবাহুর্গুণোপেতাঃ কুলোদ্গতাঃ॥
কালিন্দীং মিত্রবিন্দাঞ্চ সত্যাং নাগ্নজিতীং তথা।
সুতাং জাম্ববতশ্চাপি রোহিনীং কামরূপিণীম্॥
মদ্ররাজসুতাঞ্চাপি সুশীলাং ভদ্রলোচনাম্।
সাত্রাজিতীং সত্যভামাং লক্ষ্মণাং জালহাসিনীম্।
শৈব্যস্য চ সুতাং তন্বীং রূপেণাপ্সরসাং সমাং॥
১১৮ অধ্যায়ে, ৪০-৪৩ শ্লোকঃ।

এখানে পাওয়া যাইতেছে যে, লক্ষ্মণাই জালহাসিনী। তাহা ধরিয়াও পাই,—

১/কালিন্দী, ২/মিত্রবিন্দী, ৩/সত্যা, ৪/জাম্ববৎ-সুতা, ৫/রোহিণী, ৬/মাদ্রী সুশীলা, ৭/সত্রাজিতকন্যা সত্যভামা, ৮/জালহাসিনী লক্ষ্মণা, ৯/শৈব্যা

ক্রমেই শ্রীবৃদ্ধি-রুক্মিণী ছাড়া নয় জন হইল। এ গেল ১১৮ অধ্যায়ের তালিকা। হরিবংশে আবার ১৬২ অধ্যায়ে আর একটি তালিকা আছে, যথা—

অষ্টৌ মহিষ্যঃ পুত্রিণ্য ইতি প্রাধান্যতঃ স্মৃতাঃ।
সর্বা বীরপ্রজাশ্চৈব তাস্বপত্যানি মে শৃণু ||
রুক্মিণী সত্যভামা চ দেবী নাগ্নজিতী তথা।
সুদত্তা চ তথা শৈব্যা লক্ষ্মণ জালহাসিনী ||
মিত্রবিন্দা চ কালিন্দী জাম্ববত্যথ পৌরবী।
সুভীমা চ তথা মাদ্রী * * *

ইহাতে পাওয়া গেল, রুক্মিণী ছাড়া,

(১) সত্যভামা, (২) নাগ্নজিতী, (৩) সুদত্তা, (৪) শৈব্যা, (৫) লক্ষ্মণা জালহাসিনী, (৬) মিত্রবিন্দা, (৭) কালিন্দী, (৮) জাম্ববতী, (৯) পৌরবী, (১০) সুভীমা, (১১)মাদ্রী

হরিবংশকার ঋষি ঠাকুর, আট জন বলিয়া রুক্মিণী সমেত বার জনের নাম দিলেন। তাহাতেও ক্ষান্ত নহেন। ইহাদের একে একে সন্তানগণের নামকীর্তনে প্রবৃত্ত হইলেন। তখন আবার বাহির হইল—

(১২)সুদেবা, (১৩) উপাসঙ্গ, (১৪) কৌশিকী, (১৫) সুতসোমা, (১৬) যৌধিষ্ঠিরী।

(ইঁহারাও প্রধানা অষ্টের ভিতর গণিত হইয়াছেন। 'তাসামপত্যান্যষ্টানাং ভগবন্ প্রব্রবীতে মে।' ইহার উত্তরে এ সকল মহিষীর অপত্য কথিত হইতেছে।)

এছাড়া পূর্বে সত্রাজিতের আর দুই কন্যা ব্রতিনী এবং প্রস্বাপিনীর কথা বলিয়াছেন।

এ ছাড়া মহাভারতের নূতন দুইটি নাম পাওয়া যায়—গান্ধারী ও হৈমবতী।

রুক্মিণী ত্বথ গান্ধারী শৈব্যা হৈমবতীত্যপি।
দেবী জাম্ববতী চৈব বিবিশুর্জাতবেদসম্॥
মৌসলপর্ব, ৭ অধ্যায়।

সকল নামগুলি একত্র করিলে, প্রধানা মহিষী কতকগুলি হয় দেখা যাউক। মহাভারতে আছে,—

(১) রুক্মিণী, (২) সত্যভামা, (৩) গান্ধারী, (৪) শৈব্যা, (৫) হৈমবতী, (৬) জাম্ববতী

মহাভারতে আর নাম নাই, কিন্তু "অন্যা" শব্দটা আছে। তার পর বিষ্ণুপুরাণের ২৮ অধ্যায়ে ১, ২, ৩, ছাড়া এই কয়েকটা নামও পাওয়া যায়।

(৭)কালিন্দী, (৮)মিত্রবিন্দা, (৯)সত্যা নাগ্নজিতী, (১০)রোহিণী, (১১)মাদ্রী, (১২)লক্ষ্মাণা জালহাসিনী

বিষ্ণুপুরাণের ৩২ অধ্যায়ে তদতিরিক্ত পাওয়া যায়, শৈব্যা। তাঁহার নাম উপরে লেখা আছে। তার পর হরিবংশের প্রথম তালিকা ১১৮ অধ্যায়ে, ইহা ছাড়া নূতন নাম নাই, কিন্তু ১৬২ অধ্যায়ে নূতন পাওয়া যায়।

(১৩)কালিন্দী, (১৪)রোহিণী, (১৫)সভীমা

এবং ঐ অধ্যায়ে সন্তানগণনায় পাই,
(১৬)সুদেবা, (১৮) কৌশিকী, (২০)যৌধিষ্ঠিরী, (১৭)উপাসঙ্গ, (১৯)সুতসোমা

এবং সত্যভামার বিবাহকালে কৃষ্ণে সম্প্রদত্তা,
(২১) ব্রতনী, (২২) প্রস্বাপিনী।

আট জনের জায়গায় ২২ জন পাওয়া গেল।

উপন্যাসকারদিগের খুব হাত চলিয়াছিল, এ কথা স্পষ্ট। ইহার মধ্যে ১৩ হইতে ২২ কেবল হরিবংশে আছে। এই জন্য ঐ ১০ জনকে ত্যাগ করা যাইতে পারে। তবু থাকে ১২ জন। গান্ধারী ও হৈমবতীর নাম মহাভারতের মৌসলপর্ব ভিন্ন আর কোথাও পাওয়া যায় না। মৌসলপর্ব যে মহাভারতে প্রক্ষিপ্ত, তাহা পরে দেখাইব। এজন্য এই দুই নামও পরিত্যাগ করা যাইতে পারে। বাকি থাকে ১০ জন।

জাম্ববতীর নাম বিষ্ণুপুরাণের ২৮ অধ্যায়ে লেখা আছে,—

"দেবী জাম্ববতী চাপি রোহিণী কামরূপিনী।"
হরিবংশে এইরূপ,—
"সুতা জাম্ববতশ্চাপি রোহিণী কামরূপিণী।"

ইহার অর্থে যদি বুঝা যায়, জাম্ববৎসুতাই রোহিণী, তাহা হইলে অর্থ অসঙ্গত হয় না, এবং সেই অর্থই সঙ্গত বোধ হয়। অতএব জাম্ববতী ও রোহিণী একই। বাকি থাকিল ৮ জন।
সত্যভামা ও সত্যাও এক। তাহার প্রমাণ উদ্ধৃত করিতেছি।
সত্রাজিতবধের কথার উত্তরে
"কৃষ্ণঃ সত্যভামামমর্ষতাম্রলোচনঃ প্রাহ, সত্যে, মমৈষাবহাসনা।"
অর্থাৎ কৃষ্ণ ক্রোধারক্ত লোচনে সত্যভামাকে বলিলেন, "সত্যে! ইহা আমারই অবহাসনা।"

পুনশ্চ পঞ্চমাংশের ৩০ অধ্যায়ে, পারিজাতহরণে কৃষ্ণ সত্যভামাকে বলিতেছেন,—
"সত্যে! যথা ত্বমিত্যুক্তং ত্বয়া
কৃষ্ণাসকৃৎপ্রিয়ম্।"

আবশ্যক হইলে, আরও ভূরি ভূরি প্রমাণ দেওয়া যাইতে পারে। ইহা যথেষ্ট।

অতএব এই দশ জনের মধ্যে, সত্যা সত্যভামারই নাম বলিয়া পরিত্যাগ করিতে হইল। এখন আট জন পাই। যথা—

১/রুক্মিণী, ২/সত্যভামা, ৩/জাম্ববতী, ৪/শৈব্যা, ৫/কালিন্দী, ৬/মিত্রবিন্দা, ৭/মাদ্রী, ৮/জালহাসিনী লক্ষ্মণা

ইহার মধ্যে পাঁচ জন—শৈব্যা, কালিন্দী,

মিত্রবিন্দা, লক্ষ্মণা ও মাদ্রী সুশীলা—ইঁহারা তালিকার মধ্যে আছেন মাত্র। ইঁহাদের কখনও কার্যক্ষেত্রে দেখিতে পাই না। ইঁহাদের কবে বিবাহ হইল, কেন বিবাহ হইল, কেহ কিছু বলে না। কৃষ্ণজীবনে ইঁহাদের কোন সংস্পর্শ নাই। ইঁহাদের পুত্রের তালিকা কৃষ্ণপুত্রের তালিকার মধ্যে বিষ্ণুপুরাণকার লিখিয়াছেন বটে, কিন্তু তাঁহাদিগকে তখনও কর্মক্ষেত্রে দেখি না। ইঁহারা কাহার কন্যা, কোন্ দেশসম্ভূতা, তাহার কোন কথা কোথাও নাই। কেবল, সুশীলা মদ্ররাজকন্যা, ইহাই আছে। কৃষ্ণের সমসাময়িক মদ্ররাজ, নকুল সহদেবের মাতুল, কুরুক্ষেত্রের বিখ্যাত রথী শল্য। তিনি ও কৃষ্ণ কুরুক্ষেত্রে সপ্তদশ দিন, পরস্পরের শত্রুসেনা মধ্যে অবস্থিত। অনেক বার তাঁহাদের সাক্ষাৎ হইয়াছে। কৃষ্ণ সম্বন্ধীয় অনেক কথা শল্যকে বলিতে হইয়াছে, শল্য সম্বন্ধীয় অনেক কথা কৃষ্ণকে বলিতে হইয়াছে। কৃষ্ণ সম্বন্ধীয় অনেক কথা শল্যকে শুনিতে হইয়াছে, শল্য সম্বন্ধীয় অনেক কথা কৃষ্ণকেও শুনিতে হইয়াছে। এক পলক জন্য কিছুতেই প্রকাশ নাই যে, কৃষ্ণ শল্যের জামাতা বা ভগিনীপতি, বা তাদৃশ কোন সম্বন্ধবিশিষ্ট। সম্বন্ধের মধ্যে এইটুকু পাই যে, শল্য কর্ণকে বলিয়াছেন, 'অর্জুন ও বাসুদেবকে এখনই বিনাশ কর'। কৃষ্ণও যুধিষ্ঠিরকে শল্যবধে নিযুক্ত করিয়া তাহার যমস্বরূপ হইলেন। কৃষ্ণ যে মাদ্রীকে বিবাহ করিয়াছিলেন, ইহা সম্পূর্ণ মিথ্যা বলিয়াই বোধ হয়। শৈব্যা, কালিন্দী, মিত্রবিন্দা এবং লক্ষ্মণার কুলশীল, দেশ এবং বিবাহবৃত্তান্ত কিছুই কেহ জানে না। তাঁহারাও কাব্যের অলঙ্কার, সে বিষয়ে আমার সংশয় হয় না।

কেন না, কেবল মাদ্রী নয়, জাম্ববতী, রোহিণী ও সত্যভামাকেও ঐরূপ দেখি। জাম্ববতীর সঙ্গে কালিন্দী প্রভৃতির প্রভেদ এই যে, তাঁহার পুত্র শাম্বের নাম, আর পাঁচ জন যাদবের সঙ্গে মধ্যে মধ্যে দেখা যায়। কিন্তু শাম্ব কার্যক্ষেত্রে অবতীর্ণ, কেবল এক লক্ষ্মণাহরণে। লক্ষ্মণা দুর্যোধনের কন্যা। মহাভারত যেমন পাণ্ডবদিগের জীবনবৃত্ত, তেমনি কৌরবদিগেরও জীবনবৃত্ত।লক্ষ্মণাহরণে যদি কিছু সত্য থাকিত, তবে মহাভারতে লক্ষ্মণাহরণ থাকিত। তাহা নাই। লক্ষ্মণাহরণ ভিন্ন যদুবংশধ্বংসেও শাম্বের নায়কতা দেখা যায়। তিনিই পেটে মুসল জড়াইয়া মেয়ে সাজিয়াছিলেন। আমি এই গ্রন্থের সপ্তম খণ্ডে বলিয়াছি যে, এই মৌসলপর্ব প্রক্ষিপ্ত। মুসল-ঘটিত বৃত্তান্তটা অতিপ্রকৃত, এজন্য পরিত্যাজ্য। জাম্ববতীর বিবাহের পরে সুভদ্রার বিবাহ—অনেক পরে। সুভদ্রার পৌত্র পরিক্ষিৎ তখন ৩৬ বৎসরের, তখন যদুবংশধ্বংস। সুতরাং যদুবংশধ্বংসের সময় শাম্ব প্রাচীন। প্রাচীন ব্যক্তির গর্ভিণী সাজিয়া ঋষিদের ঠকাইতে যাওয়া অসম্ভব। জাম্ববতী নিজে ভল্লুককন্যা, ভল্লুকী। ভল্লুকী কৃষ্ণভার্যা বা কোন মানুষের ভার্যা হইতে পারে না। এই জন্য রোহিণীকে কামরূপিণী বলা হইয়াছে। কামরূপিণী কেন না, ভল্লুকী হইয়াও মানবরূপিণী হইতে পারিতেন। কামরূপিণী ভল্লুকীতে আমি বিশ্বাসবান্ নহি, এবং কৃষ্ণ ভল্লুককন্যা বিবাহ করিয়াছিলেন, তাহাও বিশ্বাস করিতে পারি না।

সত্যভামার পুত্র ছিল শুনি, কিন্তু তাঁহারা কোন কার্যক্ষেত্রে উপস্থিত নহেন। তাঁহার প্রতি সন্দেহের এই প্রথম কারণ। যবে সত্যভামা নিজে রুক্মিণীর ন্যায় মধ্যে মধ্যে কার্যক্ষেত্রে উপস্থিত বটে। তাঁহার বিবাহবৃত্তান্তও সবিস্তারে আলোচনা করা গিয়াছে।

মহাভারতের বনপর্বের মার্কণ্ডেয়সমস্যা-পর্বাধ্যায়ে সত্যভামাকে পাওয়া যায়। ঐ পর্বাধ্যায় প্রক্ষিপ্ত; মহাভারতের বনপর্বের সমালোচনাকালে পাঠক তাহা দেখিতে পাইবেন। ঐখানে দ্রৌপদীসত্যভামা সংবাদ বলিয়া একটি ক্ষুদ্র পর্বাধ্যায় আছে, তাহাও প্রক্ষিপ্ত। মহাভারতীয় কথার সঙ্গে তাহার কোন সম্বন্ধ নাই। উহা স্বামীর প্রতি স্ত্রীর কিরূপ আচরণ কর্তব্য, তৎসম্বন্ধীয় একটি প্রবন্ধমাত্র। প্রবন্ধটার লক্ষণ আধুনিক।

তার পর উদ্যোগপর্বেও সত্যভামাকে দেখিতে পাই—যানসন্ধি-পর্বাধ্যায়ে। সে স্থানও প্রক্ষিপ্ত, যানসন্ধি-পর্বাধ্যায়ের সমালোচনা কালে দেখাইব। কৃষ্ণ, কুরুক্ষেত্রের যুদ্ধে বরণ হইয়া উপপ্লব্য নগরে আসিয়াছিলেন—যুদ্ধযাত্রায় সত্যভামাকে সঙ্গে আনিবার সম্ভাবনা ছিল না, এবং

কুরুক্ষেত্রের যুদ্ধে যে সত্যভামা সঙ্গে ছিলেন না, তাহা মহাভারত পড়িলেই জানা যায়। যুদ্ধপর্ব সকলে এবং তৎপরবর্তী পর্ব সকলে কোথাও আর সত্যভামার কথা নাই।

কেবল কৃষ্ণের মানবলীলাসম্বরণের পর, মৌসলপর্বে সত্যভামার নাম আছে। কিন্তু মৌসলপর্বও প্রক্ষিপ্ত, তাহাও পরে দেখাইব।

ফলতঃ মহাভারতের যে সকল অংশ নিঃসন্দেহে মৌলিক বলিয়া স্বীকার করা যাইতে পারে, তাহার কোথাও সত্যভামার নাম নাই। প্রক্ষিপ্ত অংশ সকলেই আছে। সত্যভামা সম্বন্ধীয় সন্দেহের এই দ্বিতীয় কারণ।

তার পর বিষ্ণুপুরাণ। বিষ্ণুপুরাণে ইঁহার বিবাহবৃত্তান্ত স্যমন্তক মণির উপাখ্যানমধ্যে আছে। যে আষাঢ়ে গল্পে কৃষ্ণের সঙ্গে ভল্লুকসুতার পরিণয়, ইঁহার সঙ্গে পরিণয় সেই আষাঢ়ে গল্পে। তার পর কথিত হইয়াছে যে, এই বিবাহের জন্য দ্বেষবিশিষ্ট হইয়া শতধন্বা সত্যভামার পিতা সত্রাজিতকে মারিয়াছিলেন। কৃষ্ণ তখন বারণাবতে, জতুগৃহদাহপ্রবাদ জন্য পাণ্ডবদিগের অন্বেষণে গিয়াছিলেন। সেইখানে সত্যভামা তাঁহার নিকট নালিশ করিয়া পাঠাইলেন। কথাটা মিথ্যা। কৃষ্ণ তখন বারণাবতে যান নাই—গেলে মহাভারতে থাকিত। তাহা নাই। এই সকল কথা সন্দেহের তৃতীয় কারণ।

তার পর, বিষ্ণুপুরাণে সত্যভামাকে কেবল পারিজাতহরণবৃত্তান্তে পাই। সেটা অনৈসর্গিক অলীক ব্যাপার; প্রকৃত ও বিশ্বাসযোগ্য ঘটনায় তাঁহাকে বিষ্ণুপুরাণে কোথাও পাই না। সন্দেহের এই চতুর্থ কারণ।

মহাভারতে আদিপর্বে সম্ভব-পর্বাধ্যায়ে সপ্তষট্টি অধ্যায়ের নাম 'অংশাবতরণ'। মহাভারতের নায়কনায়িকাগণ কে কোন্ দেব দেবী অসুর রাক্ষসের অংশে জন্মিয়াছিল, তাহাই ইহাতে লিখিত হইয়াছে। শেষ ভাগে লিখিত আছে যে, কৃষ্ণ নারায়ণের অংশ, বলরাম শেষ নাগের অংশ প্রদ্যুম্ন সনৎকুমারের অংশ, দ্রৌপদী শচীর অংশ, কুন্তী ও মাদ্রী সিদ্ধি ও ধৃতির অংশ। কৃষ্ণমহিষীগণ সম্বন্ধে লেখা আছে যে, কৃষ্ণের ষোড়শ সহস্র মহিষী অপ্সরাগণের অংশ এবং রুক্মিণী লক্ষ্মী দেবীর অংশ। আর কোনও কৃষ্ণমহিষীর নাম নাই। সন্দেহের এই পঞ্চম কারণ। সন্দেহের এ কারণ কেবল সত্যভামা সম্বন্ধে নহে। রুক্মিণী ভিন্ন কৃষ্ণের সকল প্রধানা মহিষীদিগের প্রতি বর্তে। নরকের ষোড়শ সহস্র কন্যার অনৈসর্গিক কথাটা ছাড়িয়া দিলে, রুক্মিণী ভিন্ন কৃষ্ণের আর কোনও মহিষী ছিল না, ইহাই মহাভারতের এই অংশের দ্বারা প্রমাণিত হয়।

ভল্লুকদৌহিত্র শাম্ব সম্বন্ধে যাহা বলিয়াছি, তাহা বাদ দিলে, রুক্মিণী ভিন্ন আর কোনও কৃষ্ণমহিষীর পুত্র পৌত্র কাহাকেও কোন কর্মক্ষেত্রে দেখা যায় না। রুক্মিণীবংশেই রাজা হইল—আর কাহারও বংশের কেহ কোথাও রহিল না।

এই সকল কারণে আমার খুব সন্দেহ যে, কৃষ্ণের একাধিক মহিষী ছিল না।

কৃষ্ণ একাধিক বিবাহ করিয়াছিলেন কি না, সে বিষয়ে কোন গণনীয় প্রমাণ নাই, ইহা দেখিয়াছি। যদি করিয়া থাকেন, তবে কেন করিয়াছিলেন, তাহারও কোন বিশ্বাসযোগ্য ইতিবৃত্ত নাই। যে যে তাঁহাকে স্যমন্তক মণি উপহার দিল, সে সঙ্গে সঙ্গে অমনি একটি কন্যা উপহার দিল, ইহা পিতামহীর উপকথা। আর নরকরাজার ষোল হাজার মেয়ে, ইহা প্রপিতামহীর উপকথা। আমরা শুনিয়া খুসী—বিশ্বাস করিতে পারি না।

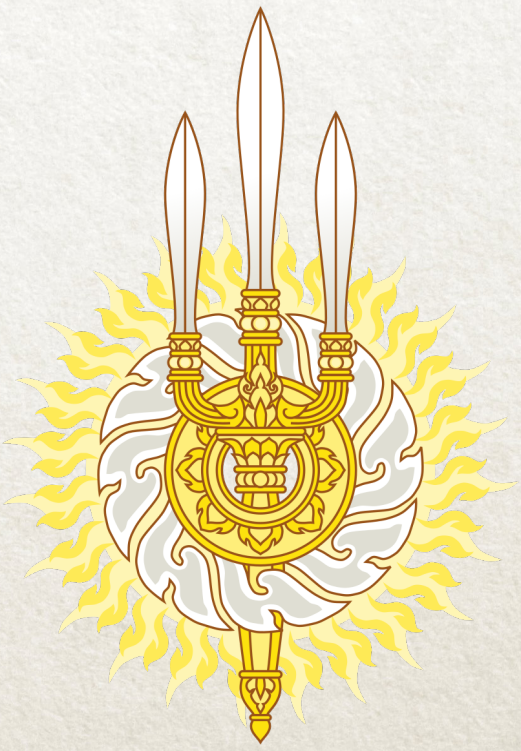

"নক্ষত্রের মধ্যে চন্দ্র" এ বৈজ্ঞানিক ভুলের শঙ্কার সমাধান

শ্রীমতি অর্পিতা দাস অপরাজিতা

গীতার ১০/২১ এ "জ্যোতিষ্কের মধ্যে সূর্য্য এবং নক্ষত্রের মধ্যে চন্দ্র আমি " এই অংশটুকু নিয়ে
জ্যোতিষশাস্ত্রীয় জ্ঞানের অভাবে অনেকের মধ্যে সন্দেহের উৎপত্তি হয় এবং গীতায় বৈজ্ঞানিক ভুল খুঁজতে থাকে অল্পজ্ঞ ব্যক্তিগণ। কেননা বিজ্ঞানের ভাষায় চন্দ্র পৃথিবীর উপগ্রহ। চলুন এই শঙ্কার সমাধান করা যাক।

প্রথমতঃ গীতার উক্ত শ্লোকের প্রচলিত অর্থ দেখি:

আদিত্যানামহং বিষ্ণুর্জ্যোতিষাং রবিরংশুমান্ ।
মরীচির্মরুতামস্মি নক্ষত্রাণামহং শশী ।।
গীতা ১০.২১

দ্বাদশ আদিত্যের মধ্যে আমি বিষ্ণু নামক আদিত্য। জ্যোতিষ্কগণের মধ্যে আমি কিরণমালী সূর্য। মরুৎগণের মধ্যে আমি মরীচি এবং নক্ষত্রগণের মধ্যে চন্দ্র।

आदित्यानामहं विष्णुर्ज्योतिषां रविरंशुमान्।
मरीचिर्मरुतामस्मि नक्षत्राणामहं शशी ॥ २१ ॥

अहम्	- मैं	अंशुमान्	- किरणोंवाला		(और)
आदित्यानाम्	- अदितिके पुत्रोंमें	रविः	- सूर्य हूँ।	नक्षत्राणाम्	- नक्षत्रोंका अधिपति
विष्णुः	- विष्णु (वामन)	अहम्	- मैं		
ज्योतिषाम्	- (और) प्रकाशमान वस्तुओंमें	मरुताम्	- मरुतोंका	शशी	- चन्द्रमा
		मरीचिः	- तेज	अस्मि	- हूँ।

অধিকাংশ অনুবাদক আদিত্যের ব্যাখ্যাতে পৌরাণিকমতে দ্বাদশ আদিত্যের নাম বলেছেন দেখা যাচ্ছে এই সকল নাম সূর্যের প্রতিশব্দ মাত্র। কিন্তু উক্ত শ্লোকে আদিত্য বলতে সূর্য অর্থ করা অনুচিত । কারণ এ শ্লোকেই বলা হয়েছে "জ্যোতিষ্কগণের মধ্যে আমি কিরণমালী সূর্য " । সুতরাং যদি বিষ্ণু দ্বারা সূর্যই বোঝাতো তবে জ্যোতিষ্কের বেলাতে আলাদা করে বলা হতো না ।

আদিত্য সম্পর্কে প্রশ্ন উপনিষদে ১.১১ বলা হয়েছে -

পঞ্চপাদং পিতরং দ্বাদশাকৃতিং দিব আহুঃ পরে অর্ধে পুরীষিণম্ ।
অথেমে অন্য উ পরে বিচক্ষণং সপ্তচক্রে ষডর আহুরর্পিতমিতি ।।

কালবিদগণআদিত্যকে পঞ্চপাদযুক্ত,দ্বাদশআকৃতি বিশিষ্ট,দ্যুলোকের পরার্ধে অবস্থিত,জলবর্ষণকারী পিতা বলিয়াছেন । অপর কালবিদেরা বলেন- উর্ধ্বদেশে ৭টি চক্র ও ৬টি অরবিশিষ্ট রথে স্থিত নিপুণ আদিত্যে এই জগৎ স্থিত

पंचपादं पितरं द्वादशाकृतिं दिव आहुः परे अर्द्धे पुरीषिणम् । अथेमे अन्ये उ परे विचक्षणं सप्तचक्रे षडर आहुरर्पितमिति ॥११॥

11. The sun, being nourisher of all beings (including trees, vegetable, herbs etc. is called *pitar*, being cause of four seasons is called *panchapadam* (five-footed), and, being cause of 12 months, is called *dwadashakriti* (twelve-faced), existing even beyond the moon, the stars etc. But some other wise men call him as sitting glorified in a seven wheeled chariot (due to emission of seven kinds of rays) fitted with six spokes (due to its being cause of six seasons).

১ম আদিত্য=সংবৎসর । ১
২টি আকৃতি=১২টি মাস
৫ পদ=৫ ঋতু[হেমন্ত ও শীত একত্রে ১টি ধরে]

২য় আদিত্য=সূর্য
৭টি চক্র সপ্ত রশ্মি
৬টি অর=৬ ঋতু ।

পুরীষী[জলবর্ষণকারী]=জীব যেমন অন্ন জলাদি গ্রহণ করে তা পুরীষ [মল] ত্যাগ করে তেমনি আদিত্য সংজ্ঞাত্মক সূর্য তাঁরকিরণ দ্বারা জল বাষ্পীভূতকরণপূর্বক মেঘাদি ও তৎ পশ্চাৎ বৃষ্টিকে মলের ন্যায় ত্যাগ করেন ।
সুতরাং আদিত্য সূর্য ও সংবৎসর দুটোই বোঝায়।

উক্ত মন্ত্রে আদিত্যের ১২ রূপের ব্যাখ্যা বৃহদারণ্যক এ বলা হয়েছে নিম্নরূপ-

শাকল্য: আদিত্যগণ কে কে?
যাজ্ঞবল্ক্য: সংবৎসরের যে ১২টি মাস ইহারাই আদিত্য। ইহারা সকলকে লইয়া [আদদানাঃ] চলিয়া যান [যন্তি],এই জন্য ইহাদের নাম আদিত্য ।
বৃহদারণ্যক ৩.৯.৫

कतम आदित्या इति ; द्वादश वै मासाः संवत्सरस्य, एत आदित्याः, एते हीदं सर्वमाददाना यन्ति ; ते यदिदं सर्वमाददाना यन्ति तस्मादादित्या इति ॥ ५ ॥

5. 'Which are the Âdityas?' 'The twelve months (are parts) of a year; these are the Âdityas, for they go taking all this with them. Because they go taking all this with them, therefore they are called Âdityas.'

অর্থাৎ দ্বাদশ মাসই আদিত্য তথা সংবৎসরের ১২টি রূপ ।

এখন আদিত্য শব্দের ব্যাকরণগত বিশ্লেষণে পাচ্ছি -
সুতরাং আদিত্য শব্দের অর্থ আমরা পাচ্ছি -
১.সূর্য , তথা মধ্যগগনের বিষ্ণু বা সুর্য
২.সংবৎসর তথা ১২ মাস
৩.অখণ্ডনীয় পদার্থ।
আমরা আগেই দেখিয়েছি এখানে আদিত্য মধ্যে বিষ্ণু সূর্য করা পুনরুক্তি দোষে দুষ্ট হবে । দ্বিতীয়তঃ যদি আদিত্য মাস ধরা হয় তবেও তা ভুল হবে । কারণ গীতাতেই পরবর্তীএকটি শ্লোকে আলাদা করে মাসের কথা উল্লেখ রয়েছে

বৃহৎসাম তথা সাম্নাং গায়ত্রী ছন্দসামহম্ ।
মাসানাং মার্গশীর্ষোহহমৃতূনাং কুসুমাকরঃ ।।
গীতা ১০.৩৫

আমি সামবেদোক্ত মন্ত্রসকলের মধ্যে বৃহৎ সাম, ছন্দোবিশিষ্ট মন্ত্রের মধ্যে গায়ত্রী; আমি বৈশাখাদি দ্বাদশ মাসের মধ্যে অগ্রহায়ণ মাস, এবং ঋতুসকলের মধ্যে বসন্ত ঋতু ।

অর্থাৎ এখন আদিত্য অর্থ রইল কেবলমাত্র অখণ্ডনীয় পদার্থ ।

এরপর বিষ্ণুর অর্থ সূর্যের পাশাপাশি ব্যাকরণগত ভাবে পাই সর্বব্যাপক ঈশ্বর । এটি বৈদিক কোষেও উল্লেখিত হয়েছে ।

পরবর্তী শঙ্কাটি হচ্ছে "নক্ষত্রদের মধ্যে আমি চন্দ্র " । বৈদিক জ্যোতিষ মতে ২৮টি (মতান্তরে ২৭টি) নক্ষত্র রয়েছে ।

২৮টি নক্ষত্রের নাম যথাক্রমে –

(১) অশ্বিনী (২) ভরণী (৩) কৃত্তিকা (৪) রোহিণী (৫) মৃগশিরা (৬) আর্দ্রা (৭) পুনর্বসু (৮) পুষ্যা (৯) রেবতী (১০) অশ্লেষা (১১) মঘা (১২) পূর্বফাল্গুনী (১৩) উত্তরফাল্গুনী (১৪) হস্তা (১৫) চিত্রা (১৬) স্বাতী (১৭) বিশাখা (১৮) অনুরাধা (১৯) জ্যেষ্ঠা (২০) মূলা (২১) পূর্বাষাঢ়া (২২) উত্তরাষাঢ়া (২৩) শ্রবণা (২৪) ধনিষ্ঠা (২৫) শতভিষা (২৬) পূর্ব্বভাদ্রপদ (২৭) উত্তরভাদ্রপদ (২৮) অভিজিৎ

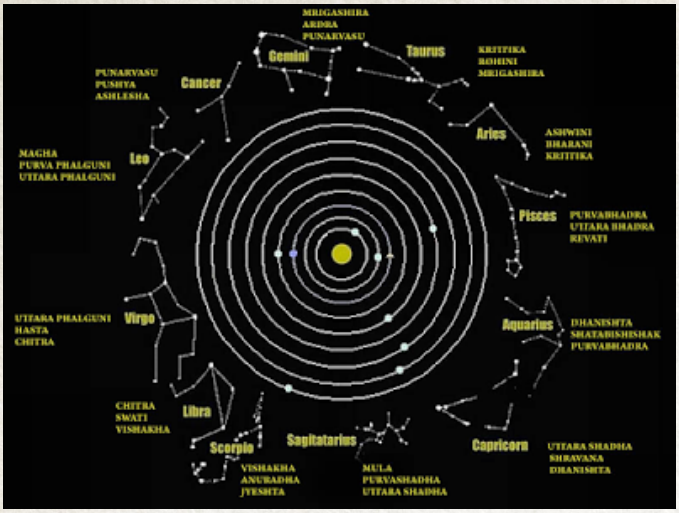

এখানে নক্ষত্রের সংজ্ঞা বর্তমানে প্রচলিত সংজ্ঞার মত নয় । উদাহরণ স্বরূপ

পরমাণুর ইংরেজি প্রতিভাষ্য Atom যা গ্রীক শব্দ থেকে Atomos এসেছে । অর্থ অবিভাজ্য কণা । কারণ প্রাচীন ধারণামতে পরমাণু অবিভাজ্য । কিন্তু পরমাণুর প্রোটন এবং নিউট্রন কোয়ার্ক নামক আরো ক্ষুদ্র কণিকা দ্বারা গঠিত বলে বিভাজ্য । একমাত্র অবিভাজ্য উক্ত কোয়ার্ক এবং ইলেক্ট্রন । অর্থাৎ পরমাণু নামগত ভাবে অবিভাজ্য হলেও তার অভ্যন্তরীণ কণিকাও বিভাজ্য । কিন্তু এতে তার নামের পরিবর্তন করা হয়নি । আর জ্যোতিষে নক্ষত্রের বিষয়টি একটু ব্যতিক্রম ।

ভারতীয় জ্যোতির্বিজ্ঞান অনুসারে নক্ষত্র হল চন্দ্রপথএর ২৮ ভাগের প্রতিটির নাম যেগুলো চন্দ্রনিবাস নামে পরিচিত । সূর্যের গতিপথকে যেমন ১২ ভাগে ভাগ করে প্রতি ভাগের নাম রাখা হয়েছে রাশি তেমনি চন্দ্রপথকে ২৮ ভাগে ভাগ করে প্রতি ভাগের নাম রাখা হয়েছে নক্ষত্র ।

বিভিন্ন দেশে এই চন্দ্রনিবাসসমূহের নাম বিভিন্ন । ভূমধ্যাঞ্চলীয় আরব ও পূর্বাঞ্চলীয় চীনসময় পরিমাপের এ প্রাকৃতিক ঘড়িটিকে ২৮ ভাগেই ভাগ ক'রে নিয়েছে । আরবীয়রা একে বলে মঞ্জিল আর চীনাদের কাছে এ সিউনামে পরিচিত । মিশরেও এমন একআকাশবিভাজন পাওয়া যায় , যা ৩৬ ভাগে বিভক্ত দেকান নামে পরিচিত। গ্রিসেএধরণের কোন চন্দ্রনিবাস চর্চার কথা জানা যায় না । গণিতজ্যোতিষে গাণিতিকভাবে ১২.৮৫৩ (বা ১২° ৫১ ৩/৭') অংশে (degree) এক নক্ষত্র ও ২.৩ নক্ষত্রে এক রাশি হিসেব করা হয় ।

অর্থাৎ নক্ষত্র এখানে চন্দ্রের বিভিন্ন অবস্থান নির্দেশ করছে । যেহেতু পৃথিবীর সম্পূর্ণ পরিক্রমা চন্দ্র ২৮ দিনে সমাপ্ত করে । ১ম দিনে যতটুকু চলে তার নাম অশ্বিনী, ২য় দিনে যতটুকু চলে তার নাম ভরণী, এভাবে ২৮ দিনে ২৮টি পথ ২৮টি নক্ষত্র নামে পরিচিত । শতপথ ব্রাহ্মণ,কল্পসুত্রে সুশৃঙ্খলতার জন্য নক্ষত্রানুসারে যজ্ঞ করার বিধি রয়েছে ।

কেউ যদি বলেন প্রাচীনকালে চন্দ্রের নিজস্ব আলো নেই এই তথ্য না জানাতে চন্দ্রকে নক্ষত্র বলা হয়েছে তবে তাদেরকে শ্রীকৃষ্ণেরও জন্মের পূর্ব এই বেদমন্ত্রটি স্বাধ্যায় করতে অনুরোধ করব-

যত্ ত্বা সূর্য স্বর্ভানু স্তমসাবিধ্যদাসুরঃ।
অক্ষেত্রবিদ্ যথা মুগ্ধো ভুবনান্যদীধয়ুঃ।।
ঋগ্বেদ ৫.৪০.৫

অর্থাৎ, হে সূর্য যাকে তুমি তোমার নিজ আলো উপহার স্বরূপ প্রদান করেছ(চাঁদ), তাঁর দ্বারা যখন তুমি আচ্ছাদিত হয়ে যাও, তখন আকস্মিক অন্ধকারে পৃথিবী ভীত হয়ে যায়।

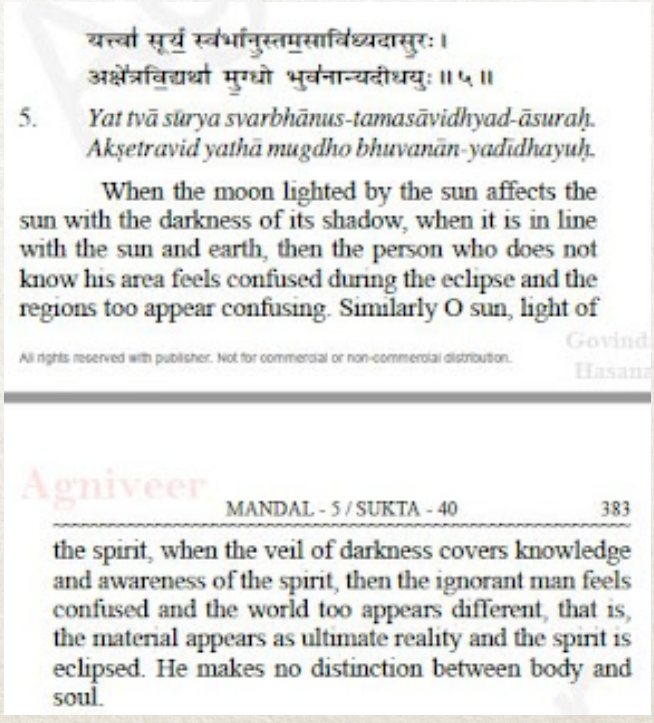
यत्त्वा सूर्य स्वर्भानुस्तमसाविध्यदासुरः।
अक्षेत्रविद्यथा मुग्धो भुवनान्यदीधयुः ॥ ५ ॥

5. *Yat tvā sūrya svarbhānus-tamasāvidhyad-āsurah.*
Akṣetravid yathā mugdho bhuvanān-yadīdhayuh.

When the moon lighted by the sun affects the sun with the darkness of its shadow, when it is in line with the sun and earth, then the person who does not know his area feels confused during the eclipse and the regions too appear confusing. Similarly O sun, light of

All rights reserved with publisher. Not for commercial or non-commercial distribution.

the spirit, when the veil of darkness covers knowledge and awareness of the spirit, then the ignorant man feels confused and the world too appears different, that is, the material appears as ultimate reality and the spirit is eclipsed. He makes no distinction between body and soul.

এখানে স্পষ্টত সূর্য গ্রহণের কথা উল্লেখ করা হয়েছে। এর কারণ চন্দ্র, রাহু নয় তাও এখানে উল্লেখ করা হয়েছে। আর ঋগ্বেদ ১০.৮৫.৯ নির্দেশ করে যে সূর্য তাঁর কন্যা চন্দ্রকে নিজ আলো উপহার স্বরূপ প্রদান করে।

Agniveer

सोमो वधूयुरभवदश्विनास्तामुभा वरा।
सूर्यां यत्पत्ये शंसन्तीं मनसा सवितादंदात्॥ ९॥

9. *Somo vadhūyurabhavadaśvināstāmubhā varā.*
Sūryāṁ yat patye śaṁsantīṁ manasā savitādadāt.

Soma is the proposer and Ashvins, pranic energies, the first attraction and attention, when Savita, giver of life and light, gives away the bride, love-lorn at heart, to the groom.

এই একই কথা ঋগ্বেদ ১.৮৪.১৫ এ আছে

अत्राह गोरमन्वत नाम त्वष्टुरपीच्यम्।
इत्था चन्द्रमसो गृहे॥ १५॥

15. *Atrāha goramanvata nāma tvaṣṭurapīcyam.*
Itthā candramaso gṛhe.

All rights reserved with publisher. Not for commercial or non-commercial distribution.

Just as here on the surface of the earth and in its environment, we know, there is the beautiful light of the sun penetrating and reaching everywhere, similarly, let all know, it is there on the surface of the moon. (Just as the sun holds and illuminates the earth and the moon, so should the ruler with his light of justice and power hold and brighten every home in the land.)

যাস্কাচার্য নিরুক্ত ২.৬ এ এই মন্ত্রের ব্যাখ্যায় বলেছেন -

'Having joints means having brilliance,' says Aupamanyava.[7] Moreover, a ray of the sun illuminates the moon.[8] That the illumination of the moon is caused by the sun is to be established by the following: Suṣumṇa is the ray of the sun, the moon is the holder.[9] This, too, is a Vedic passage. That (ray) is called *gauḥ* also. Here indeed they thought of the ray:[10] this we shall explain later on. All the rays are called *gāvaḥ* also.

(Here ends the sixth section.)

অর্থাৎ এটাই প্রমাণিত হচ্ছে আর্যরা চন্দ্রের আলো সূর্য থেকে আগত রশ্মির প্রতিফলন তা জানতেন । অতএব সর্বপ্রকার বিশ্লেষণ ও আলোচনার মাধ্যমে উক্ত শ্লোকটির যথার্থ অন্বয়-ভাষ্য নিম্নরূপ :-

आदित्यानामहं विष्णुर्ज्योतिषां रविरंशुमान् ।
मरीचिर्मरुतामस्मि नक्षत्राणामहं शशी ॥

পদার্থঃ (আদিত্যনাম্) অখন্ডনীয় পদার্থতে (অহং, বিষ্ণুঃ) আমি বিষ্ণু (জ্যোতিষাম্) জ্যোতির্ময় বস্তুত সমুহতে (রবিঃ) সূর্য (মরুতাম্) বায়ূতে মরীচি নামা বায়ু(নক্ষত্রাণাম্) নক্ষত্র মসুহের মধ্যে (অহং,শশী) আমি চন্দ্রমা।

सं०–अब सूर्य्य चन्द्रमादिकों की परमात्मा की विभूति कथन करते हैं:—

आदित्यानामहं विष्णुर्ज्योतिषांरविरंशुमान् ।
मरीचिर्मरुतामस्मि नक्षत्राणामहं शशी ॥ २१ ॥

पद०–आदित्यानां । अहं । विष्णुः । ज्योतिषां । रविः । अंशुमान् । मरीचिः । मरुतां । अस्मि । नक्षत्राणां । अहं । शशी ॥

पदा०–(आदित्यानां) अखण्डनीय पदार्थों में (अहं, विष्णुः) मैं विष्णु हूं (ज्योतिषां) ज्योति वाले पदार्थों में (रविः) सूर्य्य हूं (मरुतां) वायुओं में (मरीचिः) मरीचि नामा वायु हूं (नक्षत्राणां) नक्षत्रों में (अहं, शशी) मैं चन्द्रमा हूं ॥

ভাষ্য- যদ্যপি এই সংসাররূপ বিভূতির স্বামী হওয়াতে এই সব বিভূতিসমুহ পরমাত্মার তথাপি মুখ্য মুখ্য বিভূতিসকল পরমাত্মাকে এই জন্য বর্ননা করেছে যে, তাকি পরমাত্মার ঐশ্বর্য মূখ্য মূখ্য রূপের অনুভব করিবার জন্য সহায়ক হবে,এই অভিপ্রায়ে অখন্ড বস্তুতে ব্যপক রূপ বিষ্ণু,জ্যোতির্ময় বস্তুসমুহের মধ্যে সূর্যরূপ বায়ুতে মরীচি নামা প্রকাশ রূপ বায়ু এবং নক্ষত্রের মধ্যে চন্দ্রমা পরমাত্মার রূপ বর্নানা করা হয়েছে।

এই বিভূতি অধ্যায়ে এই রূপের বর্ননাকৃত জানা নির্বিশোষবাদী বৈদিক ব্যক্তির জন্য অনিষ্টকারক নয় এমনকি বৈদিকগনের মতে তদাত্ম্যরূপে পরমাত্মার এই রূপ নয় পরন্তু তাহার নিরুপক হওয়াতে পরমাত্মার অনন্ত রূপ , যে রূপ " সহস্রশীর্ষাঃ পুরুষঃ" (যজু ৩১/১) ইত্যাদি মন্ত্রে পরমাত্মা নিরূপক হওয়াতে সব প্রানীগনের শিরাদি আয়ব সেই পরমাত্মার কথা বলা হয়েছে, যেখানে সায়নাচার্য তার ভাষ্য লিখেছে যে, " অন্ন সর্বপ্রানিনাং শিরাংসি..... সহস্রশীর্ষাত্বং' সব প্রানীর শিরাদি আয়ব সেই পরমাত্মার বিভূতি হওয়াতে সেইসব কথা বলা হয়েছে বাস্তবে সেই ঈশ্বর নিরাকার,

আমাদের বৈদিক মতে, তো এই রূপাদিকে “ অগ্নির্মূর্দ্ধাচক্ষুষী চন্দ্রসূর্য্যৌ দিশাঃ” (মু ২/১/৪) = অগ্নি যাহার মুখস্থানীয়, চন্দ্রমা সূর্য নেত্র স্থানীয় পূর্বউত্তোর দিশাদি শোত্রস্থানীয়, বেদ মুখস্থানীয়, বায়ূ প্রানস্থানীয়, এই সমুদয় বিশ্ব যাহার হৃদয় স্থানীয়, পৃথিবী পাদ স্থানীয় এবং সেই সব ভূতের অন্তরআত্মা পরমাত্মা

अग्निर्मूर्धा चक्षुषी चन्द्रसूर्यौ दिशः श्रोत्रे वाग् विवृताश्च वेदाः ।
वायुः प्राणो हृदयं विश्वमस्य पद्भ्यां पृथिवी ह्येष सर्वभूतान्त-
रात्मा ॥४॥

4. Fire is as if the head or mouth of God, the sun and the moon are as if His eyes, the directions of space are as if His ears, the famous *vedas* are as if his tongue, the air (atmosphere) is as if His life organ (or lungs), the whole universe is as if His heart and the earth is as if His feet. He is the Soul of all souls, i. e., pervades all creatures.

এই সকল কথা ওই স্মৃতিতে বলা হয়েছে যে, দ্যুলোক যাহার মূদ্ধাস্থানীয় জ্ঞানী ব্যক্তি এরকম বর্ননা করে থাকে।

এ সকলকে রূপকালংকার বলা হয়, এ জন্য ‘ রূপোপন্যাসাচ্চ” ব্রহ্মসূত্র ১/২/২৩- তে ইহাকে রূপক বলেছে

रूपोपन्यासाच्च ॥२३॥

रूपकालंकार (अग्निर्मूर्धा चक्षुषी चन्द्रसूर्यौ। मु० ५।१।५) से भी सिद्ध होता है कि इस प्रकरण में अदृश्यत्व गुणवाला ब्रह्म है, न जीव और न प्रकृति।

अथवा भिन्न-भिन्न रूप=गुणों के कथन होने से भी परमात्मा, जीवात्मा और प्रकृति में भेद है।

রূপকের অভিপ্রায়ে সূর্য চন্দ্রমাদিকে নেত্র স্থানীয় বলা হয়েছে বাস্তবে নয়,এই প্রকার এখানেও সূর্য- চন্দ্রমাদি বিভূতিয়া পরমাত্মা কে নিরূপক হওয়াতে তাহার রূপ কথন করা হয়েছে,বাস্তবে নয়।।

পাঠকের লেখা

শ্রীকৃষ্ণের চক্র কি আসলেই কোন দিব্যাস্ত্র ?

শ্রী সন্দীপন সরকার

হরিদাসসিদ্ধান্ত বাগীশ ভট্টাচার্য প্রণীত মহাভারতের (শ্লোক সহ), উদ্যোগ পর্বের একটা কাহিনী পড়ছিলাম। কাহিনীর সেই অংশে শ্রীকৃষ্ণ কুরুক্ষেত্রের সেই রক্তক্ষয়ী মহাযুদ্ধকে আটকানোর শেষ প্রচেষ্টায়, পান্ডবদের জন্যে মাত্র পাঁচখানা গ্রাম চাইতে শান্তিদূত হিসেবে হস্তিনাপুরে রওয়ানা দিচ্ছেন। শ্রীকৃষ্ণ প্রাতকালে ঘুম থেকে উঠে সান্ধ্যোপসনা, অগ্নিহোত্র ও সূর্য প্রণাম করে তারপর ব্রাহ্মণগণকে অভিবাদন জানিয়ে তিনি রথে উঠার আগে তাঁর সেনাপতি সাত্যকি-কে বললেন—

"রথ আরোপ্যতাং শঙখশ্চক্রঞ্চ গদয়া সহ।
উপাসঙ্গাশ্চ শক্ত্যশ্চ সর্ব্বপ্রহরণানি চ।।১২।।

অর্থঃ সাত্যকি! আমার রথে শঙখ, চক্র, গদা, তূণীর, শক্তি ও অন্যান্য সকল অস্ত্র নিয়া উত্থাপিত কর।।১২।।"

"দুর্য্যোধনো হি দুষ্টাত্মা কর্ণশ্চ সহসৌবলঃ।
ন চ শক্ররবজ্ঞেয়ো দুর্ব্বলোহপি
বলীয়সা।।১৩।।

অর্থঃ কারণ, দুর্য্যোধন, কর্ণ ও শকুনির অন্তঃকরণ দূষিত এবং শক্র দুর্ব্বল হইলেও তাহাকে অবজ্ঞা করা প্রবলের উচিত নহে।"

রেফারেন্সঃ হরিদাস সিদ্ধান্ত বাগীশ ভট্টাচার্য অনুদিত মহাভারতম্, উদ্যোগপর্ব, অধ্যায়ঃ ৭৭, শ্লোকঃ ১২ ও ১৩ (VOL- 14, pdf:- page no:-771)

১২ নং শ্লোক পড়েই আমার মাথায় এই প্রশ্ন জাগলো। শ্রীকৃষ্ণের আদেশে শঙখ, গদা, তূণ ও অন্যান্য অস্ত্রকে সাত্যকি না হয় কৃষ্ণের রথের উপর রাখলেনই।

তাছাড়া, শ্লোকের অনুবাদে উল্লেখিত **"শক্তি"** নামেরই বা কোন অস্ত্র রথে রাখতে বলছেন? এটাকি সেই শক্তি অস্ত্র, যেটা দিয়ে মেঘনাদ লক্ষণকে ঘায়েল করেছিলেন।

১২ নং শ্লোকেই লক্ষ্য করে দেখলাম, সেখানেই "চক্র" শব্দটি উল্লেখিত আছে। সন্দেহ দূর করার জন্যে আরো দুটি মহাভারত ভাষ্য চেক করে দেখলাম। কালীপ্রসন্ন সিংহের মহাভারত এবং রাজশেখর বসুর সংক্ষিপ্ত মহাভারত— এই দুটি ভাষ্য চেক করেও একই কথা লেখা পেলাম। এখন কথা হল, মহাভারতের ৩ জন বিখ্যাত অনুবাদকের আলাদা আলাদা লেখা ভাষ্য তো আর একইসাথে মিথ্যা বা ভুল হতে পারেনা।

তাই, মহাভারতে এই বর্ণনার ভিত্তিতে আমার মনে হচ্ছে, চক্র একটি পার্থিব ধাতুনির্মিত মারণাস্ত্র যা শ্রীকৃষ্ণের মূখ্য বা প্রধান অস্ত্র ছিল, যা কিনা তিনি সবসময়ই নিজের সাথে রাখতেন। ঠিক যেমনটা ক্ষত্রিয়রা আত্মরক্ষার জন্য নিজেদের সাথে সবসময় তলোয়ার বা ছুরি জাতীয় কিছু একটা রাখতেন।

ইতিহাসের পাতায় শ্রীকৃষ্ণ

গবেষণা পরিষদ, বাংলাদেশ অগ্নিবীর

প্রথম ছবিটি চিনতে পারছেন কি? আজ এই তথ্যপ্রযুক্তির যুগে শ্রীকৃষ্ণের কত ছবি, কত ভাস্কর্য, কত প্রতিমা। কিন্তু একসময় কি তা ছিল? শ্রীকৃষ্ণের সবচেয়ে পুরনো ছবি কয় বছর আগের বলতে পারবেন? উত্তরটা হল আজ থেকে ঠিক ২২১০ বছর আগের !

আর হ্যাঁ ছবিতে দেখতে পাচ্ছেন ব্রিটিশ মিউজিয়ামে সংরক্ষিত থাকা যোগেশ্বর শ্রীকৃষ্ণের এখনো পর্যন্ত খুঁজে পাওয়া সবচেয়ে প্রাচীন এবং নিঃসন্দেহ ছবি। এর আরও ২০০ বছর আগের একটি ভাস্কর্য পাওয়া গেলেও সেটি আসলেই শ্রীকৃষ্ণের কিনা তা নিয়ে এখনো বিতর্ক রয়েছে।সেই কথা আরেকদিন বলব।

মূলত এটি কোন আঁকা ছবি নয় যা আপনারা ছবিতেই দেখতে পাচ্ছেন।এটি একটি মুদ্রাতে খোদাই করা শ্রীকৃষ্ণের ছবি। ইন্দো-গ্রীক রাজা আগাথোক্লেস দিকাইওস আনুমানিক খ্রিস্টপূর্ব ১৯০ সালে, আজ থেকে প্রায় ২২১০ বছর পূর্বে তার সম্রাজ্যের মুদ্রায় শ্রীকৃষ্ণের এই ছবিটি মুদ্রাংকিত করেন। ১৯৭০ সালে আফিগানিস্তানের আই-খানৌম শহরে প্রত্নতাত্ত্বিক অনুসন্ধানের সময় এই মুদ্রাটিসহ ৬ টি হিন্দুধর্মের সাথে সম্পর্কিত এমন মুদ্রা পাওয়া যায়।

দ্বিতীয় ছবিতে দেখতে পারছেন সেই ৬ টি মুদ্রার মধ্যে ২ টি মুদ্রা, একটিতে শ্রীকৃষ্ণ ও অপরটিতে শ্রী বলরামের ছবি। ১৯৬৪-১৯৭৮ সাল পর্যন্ত চলা এই ঐতিহাসিক অভিযানে প্রাচীন ভারতের গ্রীক সাম্রাজ্য সম্পর্কে অনেক প্রাচীন নমুনা উঠে আসছিল। কিন্তু ১৯৭৯ সাল থেকে শুরু হওয়া সোভিয়েত-আফগান যুদ্ধের কারণে এই অভিযান থেমে যায় এবং যুদ্ধে এই স্থানটি মারাত্মকভাবে

ক্ষতিগ্রস্ত হয় বা বলা যেতে পারে প্রায় নষ্ট হয়ে যায়। এভাবেই মানবাজাতির যুদ্ধাংদেহী মনোভাবের কারণে বন্ধ হয়ে যায় ইতিহাসের একটি বিশাল দ্বার।

তবে জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা বলরামের এখন পর্যন্ত প্রাপ্ত সবচেয়ে প্রাচীন ছবি শ্রীকৃষ্ণেরও আগের, জ্যেষ্ঠ বলে কথা !

৩য় ছবিতে দেখতে পাচ্ছেন আজকে থেকে প্রায় ২৩০০-২৪০০ বছর আগের মৌর্য সাম্রাজ্যকালীন একটি পাথরের মুদ্রা যাতে গদা ও শঙ্খ হাতে নিচের ডানকোণায় খোদাই করা রয়েছে শ্রী বলরামের ছবি! এই কয়েনটিও ব্রিটিশ মিউজিয়ামে সংরক্ষিত রয়েছে।

চতুর্থ ছবিতে দেখছেন মধ্যপ্রদেশের বিদিষায় ১৮৭৭ সালে আলেক্সান্ডার কানিংহাম কর্তৃক আবিস্কৃত হেলিওদোরাস স্তম্ভ। মধ্য প্রদেশের বিদিশায় অবস্থিত স্তম্ভটি নির্মাণ করা হয়েছিল খ্রিষ্টপূর্ব ১১৩ সালে, অর্থাৎ আজ থেকে ২১৩৩ বছর আগে। গ্রীক রাজা এন্টালসিডাসের ভারতীয় দূত হেলিওদোরাস এটি নির্মাণ করেন।

৫ম ছবিতে দেখতে পাচ্ছেন এর গায়ে কিছু কথা লেখা। অক্ষরগুলো প্রাচীন ভারতীয় ব্রাহ্মী লিপির,সেখানে তিনি লিখিয়েছিলেন-

“এটি দেবের দেব বাসুদেবের গরুড় স্তম্ভ যা নির্মাণ করেছেন ভগবত (কৃষ্ণভক্ত) হেলিওদোরাস, ডিওন এর পুত্র, তক্ষশীলা নিবাসী, বারাণসি নিবাসী রাজা কাশিপুত্র ভগভদ্র যিনি ১৪ বছর ধরে সফলভাবে শাসন করছেন তার কাছে প্রেরিত রাজা এন্টাসিডাসের গ্রীক দূত।”

আরও লেখা আছে,

“অমৃতত্ত্বের পথে তিনটি সিঁড়ি যা স্বর্গের পথে নিয়ে যায়,আত্মনিয়ন্ত্রণ,দানশীলতা ও চৈতন্য।”

এ থেকে ইতিহাসবিদগণ স্বিদ্ধান্ত দেন যে হেলিওদোরাস ছিলেন প্রাচীন গ্রীক সাম্রাজ্যের অনেক প্রভাবশালী ব্যাক্তিত্বদের মধ্যে একজন যিনি সনাতন ধর্মে দীক্ষিত হয়েছিলেন!

মাধব, বহুত মিনতি কর তুঁহে দেই তুলসী তিল

শ্রী ভানুলাল দাস
অবসরপ্রাপ্ত ডিআইজি

আগে জানতাম, মথুরায় কংসের কারাগারে মাতা দৈবকীর উদরে শ্রীকৃষ্ণের জন্ম। ভাদ্র মাসের কৃষ্ণপক্ষের অষ্টমী তিথিতে। পিতা বসুদেব যমুনা পেরিয়ে শিশু কৃষ্ণকে রেখে আসলেন ব্রজের নন্দ গোয়ালার বাড়িতে। যশোদার কোলে।

এখন শুনি, ভগবান শ্রীকৃষ্ণের জন্ম হয়নি, মায়া শক্তিবলে তিনি আবির্ভূত হয়েছিলেন। এ এক রহস্যময় ঘটনা।

রাধাকৃষ্ণের প্রণয় ঘটিত বিষয়টা আরও রহস্যময়। মহাভারত বা ভাগবতে রাধা নাই, যদিও ভাগবতে গোপীনীদের সাথে রাসলীলা আছে। সেখানে গোপীনী শ্রেষ্টা এক নারীর কথা আছে, সেই অনামিকা নারীর সাথে শ্রীকৃষ্ণের রাস খেলার মাঝে সকলের অগোছরে বিশেষ ভাব হতে দেখা যায়। গবেষকগণ মনে করেন, সেই বিশেষ নারী থেকে রাধা চরিত্র সৃষ্টি হয়েছে। ছড়িয়ে গেছে লোকগাঁথায়। আরও অনেক পরে ব্রহ্মবৈবর্ত পুরাণে রাধার অনুরাগ, বস্ত্রহরণ, অভিসার এগুলো বিস্তারিত এসেছে।

চৈতন্য পরবর্তী বাঙালি কবি বুড়ো চন্ডীদাস, মিথিলার কবি বিদ্যাপতি তাদের কবিতায় এবং কবি জয়দেব **'গীতগোবিন্দ'** কাব্যে রাধাকৃষ্ণের কাল্পনিক প্রেমকে অমরত্বে পৌঁছে দিয়েছেন। এ এক অমূল্য প্রণয় সাহিত্য যা বাঙালির নরনারীর জীবনে প্রেমকে লৌকিকতা ও অলৌকিকতা দুই দিকে সমৃদ্ধ করেছে। বৈষ্ণব কবিদের কাব্য চিরন্তন সাহিত্যের মর্যাদা পেয়েছে।

আমাদের অনেকের ধারনা বাঙালি অবতার চৈতন্যদেব রাধাকে প্রচারে এনেছেন। কথা সঠিক নয়। বৃন্দাবন, মথুরা, ব্রজধামসহ উত্তর ভারতের বিরাট অংশে রাধাকৃষ্ণ পূজিত। এমন কি কৃষ্ণকে বাদ দিয়ে রাধা নাম গাওয়া হয়। ঐ এলাকার লোকজন একজন আরেক জনকে সম্ভাষণ করে রাধে রাধে বলে। প্রত্যেক বাড়ির দরজায় রাধে রাধে লেখা। ৭৫ মাইল চৌহদ্দীর ব্রজ-বৃন্দাবন-মথুরা-বিন্ধাচল এলাকা শুধুই রাধাময়। এ নিশ্চয় চৈতন্য বা বুড়ো চন্ডীদাসের কীর্তি নয়। কারণ এই এলাকার খুব কম লোক চৈতন্যের নাম জানে। বৃন্দাবন-ব্রজের সব লোকের মুখে মুখে রাধাকৃষ্ণের প্রেমকাহিনী। রাধাকুন্ড, রাধার স্বামীর বাড়ি, রাধার বাপের বাড়ি... আরও কত কি ! এগুলো বুড়ো চন্ডীদাসের প্রভাবে হয়নি।

ঐতিহাসিক দৃষ্টকোণ থেকে এর বিচার করা খুবই দুরুহ, কারণ হিন্দুর ইতিহাস আর কল্পনা একাকার হয়ে মিথ ও পুরাণে স্থান পেয়েছে। সেইভাবে কোনো ইতিহাসও নেই। আর পুরাণ সব সম্ভবের স্থান। এখানে পাখি, বানর, গাছ, পাথর কথা বলে, মানুষের চেয়ে ইতর প্রাণি বেশি বুদ্ধিজ্ঞান রাখে। এইসব নিয়ে কথা চলে না।

বঙ্কিম চন্দ্র চট্টোপাধ্যায়ে কৃষ্ণচরিতে বলেছেন, রাধার সাথে প্রেম, বস্ত্রহরণ এইসব হালকা জিনিস ভগবান শ্রীকৃষ্ণ চরিত্রের সাথে যায় না। গীতা নিয়ে তর্কবিতর্ক করা যায়, কিন্তু এটি যে, আধ্যাত্মিক, নৈতিক ও দার্শনিক মতামতের

মহাগ্রন্থ, এ নিয়ে সন্দেহ নাই। এই গ্রন্থ ভারতবর্ষের আদি সকল প্রগতিশীল, রক্ষণশীল, প্রতিক্রিয়াশীল মতামতকে ধারন করে আছে। এই গ্রন্থে যার মতাদর্শ আছে, মহাভারতে যার এত সন্মান খ্যাতি যশ - তার সাথে এই ধরনের প্রণয়গাঁথা ঠিক মিলে না।

কিন্তু কৃষ্ণের সাথে রাধা কাল্পনিক হলেও এমন ভাবে মিশে গেছে যে আজ আর পৃথক করার উপায় নাই। তাই জীবাত্মা-পরমাত্মা, জীব-জড়, জীবনমৃত্যু, শক্তি-শক্তিমান, পৃথিবী-স্বর্গ, ভক্ত-ভগবান, মোক্ষ-পূন্য, প্রেম-প্রেমিক, মায়া-ঈশ্বর... ইত্যকার দ্বৈতবাদ এনে এই অগ্রহণযোগ্য প্রণয়োপখ্যানকে যৌক্তিকতা দেয়ার চেষ্টা করা হচ্ছে। এবং এমনটি করা স্বাভাবিক, নতুবা যে ভক্তিবাদী বৈষ্ণবগন রাধাকৃষ্ণকে উপাসনা করেন তারা নৈতিক জায়গাটা হারিয়ে ফেলবেন। অনৈতিক অবস্থানে থেকে কেউ শ্রদ্ধা বা পূজা পেতে পারেন না, এমন কি তিনি ভগবান শ্রীকৃষ্ণ হলেও।

গীতায় কি জিহাদের উপদেশ দেওয়া হয়েছে?

মূল লেখক-শ্রী বিষ্ণু বিশাল শর্মা।
ভাষান্তর ও পরিমার্জন- শ্রী সুব্রত দেবনাথ

প্রায়শই অনেক প্রকারের বিভিন্ন বিচারধারা সম্পন্ন লোক গীতায় এই আরোপ দিতে থাকে যে গীতায় জিহাদের কথা বলা হয়েছে এবং ভগবান শ্রীকৃষ্ণ দ্বারা এক ভীষণ নরসংহারের আদেশ দেওয়া হয়েছে। কিন্তু আশ্চর্যের কথা হলো এসকল লোক না তো কখনো গীতা হাতে নিয়েও দেখেছে আর না গীতা পড়েছে। এ শ্রেণীর লোকজন শুধু শুনা কথাকেই মুখে মুখে প্রচার তথা মিথ্যাচার করতে থাকে। কিন্তু সত্য এর সম্পূর্ণ বিপরীতই হয়ে থাকে।
আসুন দেখি সত্য আসলে কি?

যখন ভগবান শ্রীকৃষ্ণ পাণ্ডবদের অধিকার ফিরিয়ে দেওয়ার জন্য হস্তিনাপুর রাজসভায় গেলেন তখন দুর্মতি দুর্যোধন শ্রীকৃষ্ণের এই শান্তিপ্রস্তাবকে সরাসরি অস্বীকার করে দেয় এবং বলে,

"সূচ্যগ্র নৈব দাস্যামি বিনা যুদ্ধেন কেশব"!

অর্থাৎ বিনা যুদ্ধে নাহি দিব সুচগ্র মেদিনী। বা সূচের অগ্রভাগে যে সামান্য মাটিও ধরে দুর্যোধন সেটুকুও বিনা যুদ্ধে ছেড়ে দিতে রাজি ছিলো না। অর্থাৎ যুদ্ধ ছাড়া অন্য কোনো রাস্তাই ছিল না। ভীষ্ম, দ্রোণ, কৃপের ন্যায় মহান যোদ্ধারাও বিবশ হয়ে দুর্যোধনের পক্ষ নেন। এবং তারা নিজেদের বিবশতা প্রায় একই ভাবে ব্যাক্ত করেছেন

অর্থস্য পুরোষো দাসো দাসোত্বর্থো ন কস্যচিত্।
ইতি সত্যং মহারাজ বদ্ধোহস্ম্যর্থেন কৌরবৈঃ।।
অতস্ত্বাং কলীববদ্ বাক্যং ব্রবীমি কুরুনন্দন।
ভূতোস্ম্যর্থেন কৌরব্য যুদ্ধাদন্যত্ কিমিচ্ছসি।।

অর্থাৎ:- পুরুষ অর্থের দাস। অর্থ কারো দাস নয়। এটা সত্য যে আমি কৌরবদের অর্থের দ্বারা বদ্ধ।
হে কুরুনন্দন এজন্য আজ আমি তোমার সামনে নপুংসকের মতো কথা বলছি। ধৃতরাষ্ট্রের পুত্ররা অর্থ দিয়ে আমার ভরণ পোষণ করেছো এজন্য তোমাদের পক্ষ নিয়ে পাণ্ডবদের সাথে যুদ্ধ করার অতিরিক্ত, কি চাও? বলো।

(ভীষ্ম, দ্রোণ, কৃপ,ও শল্য সবাই প্রায় একই কথা বলেছেন। পুনরুক্তি দোষ না হোক সেজন্য সবার বচন দেওয়া হলো না। আগ্রহী পাঠক বিস্তারিত জানতে মহাভারতের ভীষ্মপর্বের ভীষ্মবধ পর্বাধ্যায় পড়তে পারেন।)

এর দ্বারা তাদের বিবশতা প্রমাণিত হয় এবং বোঝা যায় যে তারা জানতেন যে তারা অন্যায়ের পক্ষ নিচ্ছেন। এবং অন্যায়কারীর পক্ষপাতী ব্যাক্তিও ততটুকু দোষী হয় যতটুকু অন্যায়কারী হয়।

এখন আসি শ্রীমদ্ভগবদগীতায়,

যদিও অর্জুন আত্মীয় শোকে বিষাদগ্রস্ত হয়ে গিয়েছিলেন কিন্তু তিনি তখনও কৌরবদের আততায়ী এবং দুষ্ট বলে উল্লেখ করেন। দেখুন

পাপমেবাশ্রয়েদস্মান্ হত্বৈতানাততায়িনঃ ।
তস্মান্নাহা বয়ং হন্তুং ধার্তরাষ্ট্রান্ সবান্ধবান্ ।
স্বজনং হি কথং হত্বা সুখিনঃ স্যাম মাধব ॥

অর্থাৎ- যদিও তারা আততায়ী, তবুও এই আচার্য গুরুজনদের হত্যা করলে আমরা পাপের ভাগীই হব। অতএব আমরা নিজ আত্মীয় ধৃতরাষ্ট্র পুত্রদেরকে হত্যা করতে পারি না। হে মাধব (শ্রীকৃষ্ণ) ! স্বজন হত্যা করে আমরা কীভাবে সুখী হব? (গীতা ১/৩৬)

এখানে আততায়ী শব্দটি দেখুন। বশিষ্ঠ স্মৃতিতে আততায়ীর সংজ্ঞা এভাবে দেওয়া হয়েছে -

অগ্নিদো গরদশ্চৈব শস্ত্রপাণি ধনাপর।
ক্ষেত্রদারহরশ্চৈব ষড়েন আততায়িনঃ।।

অর্থাৎ- ১. গৃহে অগ্নিসংযোগকারী।
২. খাদ্যে বিষ প্রয়োগকারী।
৩. অস্ত্র নিয়ে হত্যার উদ্দেশ্য আসা লোক।
৪. ধন অপহরণকারী।
৫. ক্ষেত কিংবা ভূমি জোরপূর্বক দখলকারী।
৬. স্ত্রী হরণকারী।

এই ছয় প্রকার দুষ্কর্মকারীদের বশিষ্ঠ স্মৃতিতে আততায়ীর সংজ্ঞার সংজ্ঞায়িত করা হয়েছে। এবং কৌরবদের মধ্যে আততায়ীর ছয়ের মধ্যে ছয় লক্ষণই বর্তমান ছিল।

যেমন দেখুন -
১. কৌরবরা লাক্ষাগৃহে অগ্নিসংযোগ দ্বারা পাণ্ডবদের হত্যাচেষ্টা করেছিল।
২. ভীমকে বিষ মিশ্রিত খাবার খাইয়ে মেরে ফেলার পরিকল্পনা করেছিল।
৩. পাণ্ডবদের হত্যার জন্য অস্ত্রশস্ত্র নিয়ে সদা প্রস্তুত ছিল।
৪. দ্যুতক্রীড়ার ছল করে পাণ্ডবদের রাজ্যপাট, ধন সম্পদ আত্মসাৎ করেছিল।
৫. দুঃশাসন দ্বারা ভরা রাজসভায় মহারাণী দ্রৌপদীকে চরম অপমান এবং বিবস্ত্র করার চেষ্টা করেছিল এবং জয়দ্রথ দ্রৌপদীকে অপহরণ করার চেষ্টা করেছিল।
৬. জীবিকার জন্য পাণ্ডবদের অধিকার সঙ্গত পাঁচ গ্রামও দিতে রাজি ছিল না। এমনকি সূচের অগ্রভাগে লেগে থাকা ভূমিটুকুও দিতে অসম্মত ছিলো।

এই প্রকারে কৌরবগণ ঘোর আততায়ী ছিল এবং এসকল দুষ্ট অবশ্যই বধের যোগ্য। মনুস্মৃতিতে মহারাজ মনু এসকল আততায়ীদের দেখামাত্র বধ করার আদেশ দিয়েছেন।

আততায়িনমায়ান্তং হত্যাদেবাবিচারয়ন্।

এজন্য ভগবান শ্রীকৃষ্ণ এদেরকে বধযোগ্য মনে করতেন। কেননা যে দেশের গণ্যমান্য লোকজনই পাপী এবং আততায়ী সেখানের প্রজারাও ধীরে ধীরে সেরকম হয়ে যায়।

উপরে এটা স্পষ্ট করা হলো যে কুরুক্ষেত্রের যুদ্ধে কৌরবদের সংহার কেন আবশ্যক ছিল। এখন এই প্রশ্ন উঠতে পারে যে তখন পরিস্থিতি ভিন্ন ছিল কিন্তু এখন যদি কেউ গীতা অধ্যয়ন করে তাহলে কি তার মনে যুদ্ধ - হিংসাত্মক বিচার উৎপন্ন হবে না? কেননা সেখানে তো লাগাতার যুদ্ধের উপদেশই দেওয়া হয়েছে।

উত্তর- না। কেননা গীতায় যুদ্ধকে এক রূপক মানা হয়েছে। প্রকৃতপক্ষে গীতার মুখ্য প্রতিপাদ্য বিষয় যুদ্ধ করা নয় বরং কর্ম করা। হাত পা গুটিয়ে বসে থাকা গীতার দৃষ্টিতে পাপ। এজন্য নিষ্কাম কর্মের বিধান দেওয়া হয়েছে যাতে মন বিক্ষিপ্ত চিন্তায় চিন্তিত না হয়ে নিয়ত কর্মই করতে থাকে।

নিয়তং কুরু কর্ম্ম ত্বং কর্ম জ্যায়ো হ্যকর্মণঃ।
শরীরযাত্রাপি চ তে ন প্রসিধ্যেদকর্মণঃ॥

অর্থাৎ - তুমি নিয়ত কর্ম কর। কর্মশূন্যতা অপেক্ষা কর্ম শ্রেষ্ঠ, কর্ম না করে তোমার দেহযাত্রাও সমাপ্তি হতে পারে না। (গীতা ৩/৮)

অর্জুন ক্ষত্রিয় ছিলেন। এজন্য আততায়ীদের বধ করা তাঁর নিয়ত কর্ম তথা অবশ্য কর্তব্য ছিলো। যেমন একজন সীমান্তরক্ষী সৈনিকের নিয়ত কর্ম সীমান্তে দেশের সীমা রক্ষা করা। ডাক্তারের কর্ম চিকিৎসা করা ইত্যাদি।

বস্তুত কোনো ইচ্ছা পূরণের জন্য যুদ্ধ করার আদেশ গীতায় দেওয়া হয় নি কারণ গীতার দৃষ্টিতে ভৌতিক বস্তু হতে সুখ প্রাপ্ত হওয়া যায় না এবং যা পাওয়া যায় তা দেখতে অমৃত লাগলেও বাস্তবে তা বিষই হয়ে থাকে।

সুখং ত্বিদানীং ত্রিবিধং শৃণু মে ভরতর্ষভ।
অভ্যাসাভ্রমতে যত্র দুঃখান্তঞ্চ নিগচ্ছতি॥
যত্তদগ্রে বিষমিব পরিণামেঽমৃতোপমম্।
তৎ সুখং সাত্ত্বিকং প্রোক্তমাত্মবুদ্ধিপ্রসাদজম্॥

অর্থাৎ- হে ভারতর্ষভ (অর্জুন) ! সুখও তিন প্রকারের হয় , এখন এগুলো শ্রবণ করো । যে সুখে মানুষ (যোগ , ধ্যান , ভজন) অভ্যাসে রমণ করে দুঃখের শেষ হয় ; সেই সুখ সাধনার শুরুতে বিষের মত মনে হয় কিন্তু পরিণামে অমৃততুল্য। যে সুখ আত্মার প্রশান্তি ও বুদ্ধি থেকে উৎপন্ন, তাকে সাত্ত্বিক বলা হয়েছে। (গীতা ১৮/৩৬-৩৭)

স্বার্থসিদ্ধির জন্য উৎপীড়ন করাকে গীতায় তামসিক কার্য বলা হয়েছে। দেখুন-

মূঢ়গ্রাহেণাত্মনো যৎ পীড়য়া ক্রিয়তে তপঃ।
পরস্যোৎসাদনার্থং বা তৎ তামসমুদাহৃতম্ ॥

অর্থাৎ -যে তপস্যা মূঢ়তাপূর্বক আগ্রহ সহকারে , মন , বাক্য এবং শরীরকে কষ্ট দিয়ে বা পরের অনিষ্ট করার জন্য করা হয় , সেই (তপস্যাকে) তামসিক (তপস্যা) বলে। গীতা ১৭/১৯

এই শ্লোকে এই দুইটি অতি মহত্ত্বপূর্ণ শব্দ রয়েছে ১. তপ ২. তামস। এদের অর্থ যথাক্রমে -

১. তপ- তপের অর্থ হলো কঠিন পরিশ্রম (hard work).
২. তামস- তামস শব্দের অর্থ তমের সাথে সম্বন্ধ রাখা। এবং তমের অর্থ হচ্ছে অন্ধকার(অজ্ঞান)। এই প্রকারে তামসীর অর্থ অন্ধকার বা অজ্ঞানযুক্ত কোনো তত্ত্ব বা কার্য।

এই প্রকারে এই শ্লোকের অর্থ হল যে কঠিন পরিশ্রম নিজের এবং অন্যের ক্ষতির কারণ হয় কিংবা কাউকে উৎপীড়নের জন্য করা হয় সেই পরিশ্রম ব্যক্তিকে অন্ধকার গর্তে (রূপক- অজ্ঞানরূপ ভয়াবহ দুঃখে) পৌছে দেয়। তাতে তার না মিলে যশ না মিলে শান্তি। বরং সারা সমাজ তাকে অভিশাপ দিতে থাকে।

এর বীপরিতে গীতায় যজ্ঞ করার জন্য উপদেশ দেওয়া হয়েছে যার মধ্যে সবার বিকাশ নিহিত রয়েছে।

যজ্ঞার্থাৎ কর্মণোঽন্যত্র লোকোঽয়ং কর্মবন্ধনঃ।
তদর্থং কর্ম কৌন্তেয় মুক্তসঙ্গঃ সমাচর॥

অর্থাৎ- হে কৌন্তেয় (অর্জুন) ! যজ্ঞার্থ কর্ম কর । যজ্ঞের উদ্দেশ্য ছাড়া যে সকল কর্ম করা যায় , সেগুলোকে কর্মবন্ধনের কারণ জানবে । অতএব যজ্ঞার্থ অনাসক্ত হয়ে কর্ম কর । (গীতা ৩/৯)

এখানে যজ্ঞ শব্দটি দ্রষ্টব্য। শতপথ ব্রাহ্মণে যজ্ঞের লক্ষণ সম্বন্ধে বলা হয়েছে **যজ্ঞ বৈ শ্রেষ্টতম কর্ম।** অর্থাৎ যজ্ঞ এই সংসারের সবচেয়ে শ্রেষ্ঠতম কর্ম।

স্বয়ং গীতাতেই চার প্রকার যজ্ঞের বিধান দেওয়া হয়েছে,

১. দ্রব্য যজ্ঞ- যঝন দ্রব্য অর্থাৎ ধনকে লোককল্যাণে লাগানো হয় তখন তাকে দ্রব্য যজ্ঞ বলে। যেমন নিজের ধন ব্যয় করে, বিদ্যালয়, হাসপাতাল ইত্যাদি স্থাপন করা ক্ষুধার্তকে অন্ন দান করা। ইত্যাদি।

২. তপোযজ্ঞ - যখন কেউ নিজের লক্ষ্যকে পূরণ করতে পূর্ণরূপে সমর্পিত হয়ে যায় এবং লক্ষের মার্গে আসা বাধা বিপত্তিকে দৃঢ়চিত্তে সহ্য করে এগিয়ে যায় তখন তাকে বলা হয় তপোযজ্ঞ।

৩. যোগযজ্ঞ - যখন কেউ সফলতা ও অসফলতাকে সমান মনে করে এবং সুখ বা দুঃখে আকুল হয় না তখন তার এই ক্রিয়াকে যোগ বলা হয়। যার লক্ষণও গীতাতেই বর্ণিত হয়েছে।

যোগস্থঃ কুরু কর্মাণি সঙ্গং ত্যক্ত্বা ধনঞ্জয়।
সিদ্ধ্যসিদ্ধ্যোঃ সমো ভূত্বা সমত্বং যোগ উচ্যতে।।

ভাবার্থ- হে ধনঞ্জয় তুমি আসক্তি ত্যাগ করে সিদ্ধি এবং অসিদ্ধিতে সমবুদ্ধি হয়ে যোগস্থিত হয়ে কর্তব্য কর্ম সম্পাদন করো। [গীতা- ২/৪৮]

এই যোগের পালন করাই হলো যোগযজ্ঞ।

৪. জ্ঞানযজ্ঞ- জ্ঞানের তাৎপর্য হলো ভালো ও মন্দের পার্থক্য করতে পারার ক্ষমতা। যা বিদ্যা দ্বারাই সম্ভব। স্বাধ্যায়, বেদ-উপনিষদের অধ্যয়ন এবং নিঃশুল্ক বিদ্যা দান ইত্যাদি হল জ্ঞানযজ্ঞ।

গীতার অতিরিক্ত মনুস্মৃতিতেও পাঁচ প্রকার যজ্ঞের বিধান দেওয়া হয়েছে - যেমন
১. ব্রহ্মযজ্ঞ- এর তাৎপর্য হল, লোকদের মধ্যে ব্রহ্মজ্ঞান প্রচার করা, উচিত অনুচিতের বিবেক জাগানো, এবং তাদের আত্মচিন্তনের জন্য প্রেরিত করা, উপাসনা করা ইত্যাদি।

২.পিতৃযজ্ঞ- গুরুজনের উচিত আদেশ মান্য করা। তাদের সেবা করা, পূর্বজগণের শুভকর্মের অনুসরণ করা ইত্যাদি।

৩. দেবযজ্ঞ- দেবযজ্ঞ হল দেবতাদের জন্য কৃত হবন তথা যজ্ঞ। সূর্য, চন্দ্র, বায়ু, আকাশ, অগ্নি আদি তত্ত্ব আমাদের বেচে থাকতে সহায়তা করে। এজন্য এসকল তত্ত্বকে দেব বলা হয়। দেবযজ্ঞ হলো হবন যজ্ঞের মাধ্যমে বায়ুমণ্ডল, আকাশ, শুদ্ধ করা। পৃথিবীর বৈচিত্র্যকে ধ্বংস থেকে রক্ষা তথা সংরক্ষণ করা ইত্যাদি।

৪. ভূতযজ্ঞ- ভূত শব্দের অর্থ হল জীবিত প্রাণী। জীবিত প্রাণীর সেবা করা, তাদেরকে নিজের খাবারের থেকে কিছু ভাগ খেতে দেওয়া ইত্যাদিকে ভূতযজ্ঞ বলে।

৫. অতিথি যজ্ঞ- এই যজ্ঞে, 'অতিথি দেবো ভবো' এই ভাবনা চরিতার্থ হয়। ঘরে আসা অতিথির আদর-সৎকার করা। অন্ন-জল ইত্যাদি দ্বারা তৃপ্ত করা ইত্যাদিকে অতিথি যজ্ঞ বলে।

এভাবে যজ্ঞ শব্দের সাথে শুভ কর্মরূপ অর্থও এসে যায়। কারণ যজ্ঞের অর্থই হলো শ্রেষ্ঠতম ও শুভ কর্ম।

গীতায় বিনা বুদ্ধি উপযোগ করা কার্যকে ভুল বলে মনে করা হয়। গীতা অনুসারে কোনো শাস্ত্রকে মান্য করার আগে ভালোভাবে বিচার করে নেওয়া উচিত। না বুঝে কারো কথা মানা উচিত নয় তা কোনো ব্যক্তিই হোক আর শাস্ত্রই হোক।

ইতি তে জ্ঞানমাখ্যাতং গুহ্যাদ্ গুহ্যতরং ময়া ।
বিমৃশ্যৈতদশেষেণ যথেচ্ছসি তথা কুরু ॥
অর্থাৎ -আমার দ্বারা এই রকম গুহ্য থেকে গুহ্যতর জ্ঞান তোমাকে বলা হলো । এটি সম্পূর্ণরূপে বিচার বিবেচনা করে যেমন ইচ্ছা , সেই রকম কর। (গীতা ১৮/ ৬৩)

মন্তব্য-। উপরে শ্রীমদ্ভগবদগীতার কারণ ও বিষয়বস্তু দুটোরই আলোচনা করা হয়েছে। গীতার যুদ্ধের আদর্শ হলো, দুষ্টের বিনাশ এবং সজ্জনদের রক্ষা। এই দুই সিদ্ধান্তের সমন্বয়ই গীতার যুদ্ধের আদর্শ। এখানে না তো কোনো লুণ্ঠন, হত্যা, নারীদের ধর্ষণ, বিক্রি করা ইত্যাদি সন্ত্রাসী কর্মকাণ্ডমূলক জিহাদের উল্লেখ পাওয়া যায় আর না তো তার উপদেশ। সুতরাং আমরা এই সিদ্ধান্তে উপনীত হলাম যে গীতায় কোনো জিহাদের উপদেশ দেওয়া হয় নি। বরং শ্রীভগবানের কণ্ঠে বিশ্বকল্যাণের জন্য উচ্চারিত হয়েছে ধর্মের রক্ষা ও অধর্মের সমূল বিনাশের অমোঘ বাণী। যার মহত্ত্ব অপপ্রচার ও মিথ্যা দ্বারা খর্ব কেউ করতে পারেনি আর করতে পারবেও না।

ইতি শম্